তেরো নম্বর বস্তি

প্রবোধকুমার সান্যাল

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫৩
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
মুদ্রাকর—পুলিনবিহারী সামন্ত,
দি প্রিন্টিং হাউস
৭০, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু' টাকা চার আনা

'তেরো নম্বর বস্‌তি'— উপন্যাসে রূপান্তরিত
করেছেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ বসু

ভূমিকা

১

'তেরো নম্বর বস্তি'—উপন্যাসখানি সম্পর্কে একটুখানি সংবাদ পাঠক-মহলকে আমি জানাতে চাই। কিছুকাল আগে বাঙ্গলার পূর্বতন লাট সাহেব মিঃ কেসী কলিকাতার বস্তি-উন্নয়নের ব্যাপার নিয়ে শহরে একটা হুজুগ তোলেন, যেমন কুখ্যাত লর্ড লিনলিথগো কয়েক বছর আগে দাগা ষাঁড়ের আন্দোলন তুলে জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন। মিঃ কেসীর এই হৈ-চৈ-এর সুযোগ নিয়ে কোনো একটি সিনেমা-কোম্পানী সরকারী মহলের সুপারিশে প্রয়োজনীয় ফিল্মের 'কোটা' আদায় করেন, এবং নানা ঘাট ঘুরে আমার কাছে এসে একটি গল্প চান্। বস্তি-উন্নয়ন পরিকল্পনা উৎসাহিত হয়—এমন একটি ফরমাসী গল্প আমি লিখে দিই, এবং উক্ত সিনেমা কোম্পানীর মালিকের সাময়িক অভিভাবক প্রসিদ্ধ আমেরিকান্ অভিনেতা শ্রীযুক্ত মেল্ভিন্ ডগলাস নাকি গল্পটি পছন্দ করেন। কলিকাতার তৎকালীন মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যেদিন ছবিখানির মহরৎ সম্পন্ন করেন, তা'র পরদিন সংবাদপত্র পাঠ ক'রে জানতে পারি, 'তেরো নম্বর বস্তি'—উপন্যাসের 'প্লট্' নাকি স্বয়ং মিঃ মেল্ভিন্ ডগলাসের তৈরী! আমার বিশ্বাস এই হাস্যকর সংবাদটি ডগলাস সাহেবের কানে ওঠেনি,—এবং উঠলে সেই ভদ্রলোক অবশ্যই প্রতিবাদ করতেন। সিনেমা জগতে আমি নতুন গল্পলেখক নই, এবং আমাকে 'প্লট্'-সরবরাহ করা মানে ঝরিয়ার কয়লাখনিতে কয়লা আমদানী করার মতো। যাই হোক, এই গল্পের হিন্দি সিনেমা-চিত্রটির নামকরণ করা হয় 'আমীরি'—এবং ছবিখানির পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া। 'আমীরি' চিত্রের

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু। ছবিখানির প্রযোজনা কালে প্রচারকার্য ব্যাপারে যতখানি গর্জন করা হয়েছিল, ততখানি বর্ষণ হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। তবে সিনেমা-গল্পের সাহিত্যিক ইজ্জৎ কিছু কম, এবং গল্পটি প্রচারকার্যপ্রধান ব'লেই যে প্রথম শ্রেণীর হয়ে ওঠেনি—একথা আমি নিজে এখনও বিশ্বাস করি। তবু 'আমীরি' গল্পটিতে উপন্যাসের দানা ছড়ানো ছিল, এটি লেখার সময় আমি বিচার ক'রে দেখেছি। এতদিন পরে তরুণ লেখক শ্রীমান্ জ্যোতিপ্রসাদ বসু বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এই দানাগুলিকে একত্র ক'রে গল্পটিকে উপন্যাসে পরিণত করেছেন। উপকরণ সমস্তই আমার, কেবল নৈবেদ্যর ডালাটি তাঁর হাতে সাজানো। তাঁর দক্ষতায় আমি খুশী। ইতি—

ঢাকুরিয়া
ফাল্গুন ৭, ১৩৫৩

প্রবোধকুমার সান্যাল

এক

রায়বাহাদুর শশধর চৌধুরীর নতুন কেনা বাগান বাড়ীটা সহরের পূর্ব-প্রান্তে। রাজপ্রাসাদের মত বিরাট বাড়ীটা আশে পাশে ফুল বাগান আর টেনিস লনের পরিধি নিয়ে সত্যই খুব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অঞ্চলটা ভাল নয়। আশেপাশে নোংরা বস্তি। চাঁদের পাশে বেয়াড়া কালো মেঘের মত বেমানান। কিন্তু জায়গাটা এতই বস্তিবহুল যে অঞ্চলটাকে বস্তি অঞ্চলই বলা হয়। এই জঘন্য পারিপার্শ্বিকের মাঝে রায়বাহাদুরের প্রাসাদখানা অসম্ভব রকম বিচিত্র দেখায়। সুন্দর উন্নত নাসার পাশে যেন একরাশ ব্রণের মত ঐ বস্তিগুলো। রসভরা ব্রণের ক্ষতগুলো এতই কদর্য্য যে ক্ষতটা সেরে গেলেও দাগটা মিলাতে সময় লাগে। ওদের কদর্যতা এতই স্পষ্ট।

জীবনের সমৃদ্ধ রাজপথে এতই গভীর বস্তির খাদ।

জমিজমা বেশ আছে শশধর চৌধুরীর মফঃস্বলে। এবং সেই কারণে তাঁকে অনায়াসে জমিদার বলা যেতে পারে। কয়েক বৎসর আগে কি একটা রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগে তিনি কি ভাবে যেন সাহায্য করেন গভর্ণমেণ্টকে। কি ভাবে, কোন সর্পিল পথে সে সাহায্য সম্ভব হয়েছিল তা অবশ্য কারও জানা নেই কিন্তু পরবর্তী ভাগ্যোন্নতির খবরটা সকলেরই জানা আছে। রায় বাহাদুর পদবীটা তারই একটা জলন্ত স্বাক্ষর।

বর্তমানে তাঁর বাগানবাড়ীর চতুঃসীমানায় যে প্রকাণ্ড বস্তি পল্লীটা

রয়েছে সেটিও কয়েক বছর হল তাঁর দখলে এসেছে। এই বস্তিতে কারা কারা থাকে, কতকগুলো চালা ঘর দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওখানকার আলিগলি কতগুলো, কোন শ্রেণীর লোক ওখানকার গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে আনাগোনা করে এ সব খবর রায় বাহাদুরের পরিবারে কোন দিনই পৌঁছায় না। পৌঁছবার প্রয়োজন বোধ হয় না বলে।

রায়বাহাদুরের বিরাট সৌধের এক পাশে পড়ে থাকে ১৩নং বস্তি আবর্জনার মত।

বস্তির চালাঘরের চতুর্দিকে ভয়াবহ আবর্জনার স্তূপ। পথের বাঁকে ওল্টানো একটা ডাস্টবিন। সামনে দুর্গন্ধময় ময়লা জলের নালা বয়ে চলেছে। এধারে মরা বিড়াল ছানা, ছেঁড়া কাঁথা-মাদুর, ভাঙ্গা হাঁড়ি, তরকারির খোসা, পচা মাছের আঁশ ইত্যাদি স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। মাছি ভন ভন করছে চারিদিকে। কর্পোরেশনের ময়লার গাড়িটাও সুযোগ বুঝে উল্টে ফেলে রেখে গেছে কে। এই উলঙ্গ কদর্যতার মাঝে উলঙ্গ শিশুরা খেলছে। মারামারি ঝটাপটি করে গড়িয়ে পড়ছে পথের ওপর। ছাই কাদা মেখে হাসছে খিল খিল করে। হাত থেকে ফস্‌কে পড়ে যাওয়া রুটির টুকরোটা কুড়িয়ে নিয়ে অম্লানবদনে মুখে দিচ্ছে। এই ছাই কাদার বীভৎসতায় এদের দৈনিক খেলাঘরের পর্ব। এই শিশু ভোলানাথদের।

এই আবর্জনার মাঝে যাদের বাঁচতে হয় তাদের অবসর নেই আবর্জনাকে ডিঙিয়ে কিছু দেখবার। যারা আছে আবর্জনার পারে তাদেরও প্রবৃত্তি নেই আবর্জনার মাঝে যারা বাঁচে তাদের খোঁজ নেবার।

তাই পাঁচীল তোলা রায় বাহাদুরের বাগানবাড়ির মধ্যে আর এক জগতের মেলা বসে। চায়ের টেবিলে বিভিন্ন সুখাদ্য আর পানীয় ঝকঝকে পেয়ালা পিরিচে সাজানো। কয়েকজন মানুষ যেমন রুণু সেন, ডাঃ অশোক মিত্র, নিখিল রায়, ডলি চৌধুরী এবং আরও জন কয়েক তরুণ তরুণীর দল—যারা কলেজটা

নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে চলে, বলে, খায় এবং তাকায় এবং সময়ে সময়ে সাজানো খাবার নিয়ে টেবিলের ধারে সাজিয়ে বসে। কথা ও হাসির যখন তুফান ওঠে তখন আতিশয্যের ভারে নরম কোচের গর্ভে ঈষৎ গড়িয়ে পড়ে এবং খাবারের টুকরো প্লেট থেকে কাঁটা চামচের ডগা দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে মুখে পোরে। মারামারি নেই, ঝটাপটি নেই, তবে কথার প্যাচে আর দৃষ্টির নানারকম তির্যকতায় একটা অপরূপ রণক্ষেত্র গড়ে ওঠে ওদের মাঝে।

ডলির প্লেটে একটা মাছি বসাতে নিখিল এই জাতীয় এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে হাঁ-হাঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে—মাছি বসেছে তোমার প্লেটে···না না তুমি ওটা খেয়ো না ডলি···।

ডলি চিন্তিত হয়। বলে তাইত!

মাছিটা ওদের বিব্রত করে ক্ষণিকের জন্যে। তারপরই আবার মানুষ-মাছিদের রসচক্র জমে উঠতে থাকে। এই মাছিদের মধ্যে বিশেষ করে উজ্জল হয়ে ওঠে বিলেত ফেরতা ~~ব্যারিস্টার~~ অশোক মিত্র, কাঁচা ব্যারিস্টার নিখিল রায় আর বালীগঞ্জের নতুন প্রজাপতি রুণু সেন। রায় বাহাদুরের মেয়ে ডলি কেবলই যেন অতিথিদের সৌজন্যে বিগলিত হতে থাকে। আর রায় বাহাদুরের স্ত্রী হেমনলিনী চায়ের টেবিলের একধারে বসে যুগপৎ চা ও চা-পায়ীদের তারিফ করতে থাকেন।

দেয়াল ঘড়িটায় চারটে বাজার সঙ্গীত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অশোক টেনিস র‍্যাকেটটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, চলো এইবার···আর নয়।

উঠে পড়ে সকলে। পিছল ডাইনিং রুমকে অতিক্রম করে, একটা ড্রাইভ ঘুরে ওরা মখমলের মত নরম সবুজ লনের মধ্যে এসে নামে। নেট সব তৈরী। ডবল সেটে খেলা শুরু হয়। অশোক-ডলি আর নিখিল-রুণু আর সকলে আশপাশে বেঞ্চীতে বসে দেখবার জন্যে। ছোকরা চাকরেরা বল

জোগায়। আর দর্শকদের জোগায় চায়ের পেয়ালা। দর্শকেরা চায়ের পেয়ালার ধোঁয়ার মতই পাতলাভাবে উপভোগ করে খেলাটা।

ওপারের পৃথিবীর খবর উড়ো হাওয়ায় ভেসে আসে। ওদিকে রাস্তার কোণে নাচের আসর বসেছে। একটি তরুণী—পরণে ঘাঘরা, গায়ে কাঁচুলি, মসলিনের বাঁকা ঘোমটা—বাজনার ধুয়ো ধরে গানের কলি গায় আর নাচে। সঙ্গের লোকটি গলায় ঝোলানো ভাঙ্গা হারমোনিয়ামের ওপর আঙ্গুল চালায় আর মাথা নাড়ে। ওদের ঘিরে বেশ লোক জমে ওঠে। ছোটয় বড়োয় মেয়ে পুরুষে মিলে বেশ একটি ছোট খাট ভিড়। বড় বড় চোখ দিয়ে উপভোগ করে ওরা। ঘুমুরের আওয়াজ আর গানের কলি হাওয়ায় ভেসে চলে—

উঁহুঁ সখি কোথায় যাবো
কোথা গেলে তারে পাবো
প্রাণের পাখী খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে গেল
উড়ে গেল……
আর এল না!…

এদিকে খেলা বেশ জমে উঠেছে। র‍্যাকেটের ডগায় ডগায় ঘা খেয়ে খেয়ে উন্মত্তের মত বলটা ছুটেছে এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। আর যারা খেলছে আর দেখছে তাদের জীবন যৌবনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কিসের শিখা যেন জ্বলে উঠেছে উন্মত্তের মত।

নাচটাও জমে উঠেছে বেশ। গানের কলির সুরের কাঁপনের মত নাচওয়ালী তরুণীর দেহটা দুলে দুলে উঠছে আর যারা দেখছে তাদের চোখে চোখে দুলছে পিপাসু মনের উন্মাদনা।

হঠাৎ পথের মাঝে হৈ চৈ ওঠায় তাল কেটে যায়। একটা মোটরের হর্ণ আর তার পরেই বিকট এক সোরগোল। কে যেন চাপা পড়লো ঐ নাচের ভীড়ের মধ্যে!

চাপা দিয়ে গাড়ীটা উর্ধ্বশ্বাসে পালায় সচকিত ও বিভ্রান্ত জনতাকে ভেদ করে। লোকগুলো এলোমেলোভাবে চেঁচায়!

"ধর ধর···চাপা দিয়ে পালাচ্ছে···"

"মোটরের নম্বর নে···"

"পুলিশ···পুলিশ···এঃ পালিয়ে গেল···"

"না পালিয়ে করবে কি? প্রাণে মরবে···"

"মার্ শালা ড্রাইভারকে···ধর···"

কিন্তু কার্যগতিকে দেখা যায় গাড়ীখানা পালিয়েছে। অগত্যা যে চাপা পড়লো তাকে নিয়ে পড়ে সকলে।

একটি ছেলে। পথের ধারে গড়িয়ে পড়েছে চোট্ লেগে। সবার ওপরে যারা বাঁচে তাদের পায়ের চাপে পিষে গেছে নীচের স্তরের মানুষ। অসম্ভব কিছু নয়! তবু রক্ত দেখে এগিয়ে আসে সকলে। চিনতে পারা যায় ছেলেটাকে। তেরো নম্বর বস্তির ভূতো পণ্ডিতের বাড়ীর ছেলে মিণ্টু। চোট্‌টা লেগেছে বেশ। এখানে ওখানে কেটে রক্ত ঝরছে। জখম পাটাই বেশী।

কে যেন অভ্যস্তের মত বলে, হাসপাতালে দাও না পাঠিয়ে!

—গরীবের আবার হাসপাতাল! কে যেন ব্যঙ্গ করে ওঠে।

ব্যাপারটা দেখবার জন্যে টেনিসলন থেকে রামু চাকরটা বেরিয়ে এসেছিল সে বলে ডাক্তার ত ওখানেই আছেন···দরকার হলে—

—তাই নাকি? চল চল দেখিগে। কয়েকজন এগিয়ে যায়।

খেলাটাও হঠাৎ থেমে গেছে গোলমাল শুনে। উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে সকলে। নিস্তরঙ্গ জলে এতটুকু একটা ঢিল পড়লেও চট করে ঢেউ ওঠে গোল গোল হয়ে, আবার মিলিয়ে যায় এক নিমিষেই।

লোক দেখে নিখিল র‍্যাকেট দুলিয়ে এগিয়ে আসে।

ওরা বলে, এখানে ডাক্তার আছেন? শুনলুম যে—

—ডাক্তার? কেন হে?

—একটা ছেলে মোটর চাপা পড়েছে।

অশোক ডলি রুণু ইত্যাদি আর সকলেও এগিয়ে আসে।

নিখিল বলে, চাপা গেছে? Sorry, মারা যায়নি ত?

আঁজ্ঞে না, তবে—

তবে ঠিক আছে! চাপা অমন পড়েই থাকে!

এগিয়ে আসে অশোক। ডাক্তার সে, তাই স্বভাবতই প্রশ্ন করে বসে, কোথায় লেগেছে?

—আঁজ্ঞে পায়ে···বড্ড রক্ত পড়ছে···

নিখিল কথাটা যেন লুফে নেয়। র‍্যাকেটটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ পড়বেই ত, রক্ত থাকলেই পড়ে! আচ্ছা thanks for the news···ও কিছু না common accident···এসো হে ডাক্তার খেলা যাক্—। নিখিল অশোকের হাত ধরে টানে।

এসব ব্যাপার যাদের চোখে নেহাৎ খেলা ছাড়া আর কিছু নয় তাদের কাছে এ ব্যবহার অপ্রত্যাশিত নয়। তবু ডাক্তার ডাকটা শুনে ওরা অশোকের দিকে উৎসুকভাবে তাকায় এবং পিছিয়ে যেতে থাকে।

কে যেন একটু বাঁকা স্বরে বলে, এরাই আবার ডাক্তার!

নিস্তরঙ্গ জলে এতটুকু একটা ঢিলে চট্ করে ঢেউ ওঠে আবার! অশোক একবার যেন ফিরে দাঁড়ায় ওদের দিকে। কিন্তু নিখিল ওর হাত ধরে টান দেয় আবার। বলে, আরে চলো চলো···যত সব nuisance!···

ওদিকে ঘটনাস্থলে কয়েকজন মিলে আহত ছেলেটিকে একটি রিক্সায় তোলে। তারপর নিয়ে চলে বস্তির দিকে। রিক্সা চলতে থাকে ঠুং ঠুং ঘণ্টা বাজিয়ে।···

আর এদিকে টেনিসলনে চায়ের পেয়ালায় চামচের আঘাতে জলতরঙ্গ বাজতে থাকে সমান তালে···ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং···।

খেলা সুরু হয় আবার নতুন করে। কিন্তু জমে না। অশোক কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। বল মিস্ করে দুবার।

ডলি বলে, হোল কি তোমার? বার বার বল মিস্ করছো!

অশোক বলে, হ্যাঁ, লোকটা মন খারাপ করে দিয়ে গেল। ভাল লাগছে না খেলতে। ডলি বলে, তুমি ভারী sensitive।

অশোক বলে, yes, it happens so. তারপর বলতে বলতে এগিয়ে আসে কোর্ট ছেড়ে। তারপর স্পোর্টিং কোটটা কাঁধে ফেলে এগিয়ে যায়।

নিখিল ও পাশ থেকে চেঁচায়, কি ডাক্তার, চললে না কি?

—হ্যাঁ। অশোকের গলার স্বর কেমন যেন নিষ্প্রভ।

ডলি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, রাত্রে এখানে খাবে ত? মনে আছে?

কথা বলবার ইচ্ছে পর্যন্ত নেই অশোকের। তাই ঘাড় নাড়িয়ে বলে, হ্যাঁ।

তারপর সোজা গিয়ে স্টার্ট দেয় তার দাঁড়ানো গাড়ীটায়।

চাকরটাকে শুধায়, হ্যাঁরে ছেলেটাকে কোন দিকে নিয়ে গেল দেখেছিস্?

অশোকের দিক ভুল হয়ে যাচ্ছে যেন!

চাকরটা বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ,···ওই আমাদের তেরো নম্বর বস্তির দিকে।···

ছোট্ট এতটুকু একটা ঢিলে যে ঢেউ উঠেছে, সে ঢেউ চক্রাকারে বাড়তে বাড়তে ওপারে গিয়ে ঠেকবেই। তা না হলে সে যেন থামবে না।

অতবড় টেনিসলনটা মুছে গিয়ে একটিমাত্র মুখ ভেসে উঠছে অশোকের সামনে। যে মুখ দিয়ে এই কয়টা কথা বেরিয়ে এলো, এরাই নাকি ডাক্তার!

সবুজ মখমলের মত মাঠে কোথায় এক চোরা পাথরে হোঁচট খেয়ে মরছে সে।

অশোক্ স্টিয়ারিংটায় চাপ দেয় তেরো নম্বরের দিকে।

বস্তির মুখে রিক্সা তখনও দাঁড়িয়ে। দুটি লোক মিণ্টুকে নিয়ে তখন ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে চলেছে। দুপাশে এসে জড় হয়েছে দরিদ্র, কুরূপ ও অর্ধনগ্ন স্ত্রী-পুরুষ ও বালকবালিকার দল। সোরগোল তোলে ওরা চারদিক থেকে। অশোক একবার থমকে দাঁড়ায় তারপর গাড়ীর ভিতর থেকে First Aid Boxটা নিয়ে বস্তির ভিতর অগ্রসর হয়।

আলোয় উজ্জ্বল সুউচ্চ পাহাড়ের শিখর থেকে সে যেন নেমে চলেছে গভীর কালো খাদের দিকে।

একদিকে উন্মুক্ত নালা আর অপরদিকে ওল্টানো ডাষ্ট বিনের মাঝ দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ। অশোক সন্তর্পণে পা ফেলে এগোয়, নিশ্বাস তার বন্ধ হয়ে আসছে যেন। আশেপাশে খাপরার ঘরগুলো মাটির দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে ঝুলে পড়েছে, মাটির মধ্যে তারা যেন মুখ লুকোতে চায়।···

আজন্ম ঐশ্বর্যের আওতায় মানুষ সে। তবু সন্থ সন্থ ডাক্তারী পাশ করে আরও উচ্চশিক্ষার জন্যে সে যখন বিলেত যায় তখন পিকাডেলীর উত্তপ্ত বিলাসের স্রোতের মধ্যে সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে। তারপর সে খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিজেকে, মানিয়ে নিয়েছে অতি সহজে।

কিন্তু, আজকের অবস্থা যেন আরও সঙ্গীন। যে ডলির রাজপ্রাসাদে তার নিত্য আনাগোনা—শুধু আনাগোনা নয়, তারই নিত্য নতুন কায়দায় অতবড় বাড়ীখানা যেন চমকে চমকে উঠেছে রোজই, সেই বাড়ীরই এত কাছে এমনি একটা জগত আছে, এত নীচে, এত অকিঞ্চিৎকর, অথচ এত ভয়ানক এত বিস্ময়···!

তবু, পিছিয়ে গেলে চলবে না। বিদ্রূপের সেই চাবুকের তাড়না তার সর্বশরীরে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। অশোক ধীর পায়ে এগিয়ে যায়।

ওরা ধরাধরি করে মিণ্টুকে নিয়ে নামায় একটা চালাঘরে। এদিকে রিক্সাওয়ালাটা চেঁচাচ্ছিল ভাড়া না পেয়ে। অশোক একটা টাকা রিক্সাওয়ালাটার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যায় চালাঘরটার দিকে।

কোলাহল তখনও চলেছে। এমন সময়ে হঠাৎ চালাঘরের ভেতর থেকে এক তরুণী বেরিয়ে আসে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিয়ে। বলে, এ কি? কি হোল? মিণ্টু...মিণ্টু...কে এমন করলে?

ভীড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলে, মোটর চাপা গেছে!

কেউ আবার অতিবিজ্ঞের মত মন্তব্য করে, যেমন ছোট ছোট ছেলেদের রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া। প্রাণে যে মরে নি এই ঢের!

তরুণীটি বসে পড়ে মিণ্টুর পাশে। মুখ তার অব্যক্ত বেদনায় ভরে উঠেছে।

মুখ তুলে তাকাতেই নজর পড়ে অশোকের দিকে। এই নোংরা বস্তির মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব বোধ হয় এই প্রথম। মেয়েটি অবাক হয়ে বলে, আপনি আপনি...। পরক্ষণেই হঠাৎ ও আন্দাজ করে নেয় ব্যাপারটা, তাই একটু রুক্ষ স্বরেই শেষ করে কথাটা ও, আপনার গাড়ীর ধাক্কাতে বোধ হয় এই ব্যাপার।

অশোক বাধা দেয় না ওর মন্তব্যে। স্পষ্ট করে বোধ হয় শোনেই না ওর কথা। আপনার মনেই বলে চলে যে কথাগুলো বলবার জন্যে ও তৈরী হয়ে এসেছিল। বলে, সরে যাও দেখি, একটু সরো তোমরা...আমি দেখছি। একটু গরম জল আনো ত' কেউ। তারপর সেই মেয়েটির দিকে নিজের কোটটা খুলে বাড়িয়ে ধরে বলে, ধরো এটা।

মেয়েটি অনায়াসে হাত বাড়িয়ে কোটটা ধরে। আশপাশের ভীড় করা স্ত্রীলোকেরা পরস্পরে কটাক্ষ করে, একটা ইঙ্গিত করে ব্যাপারটা নিয়ে।

কোটটা ধরলেও মুখের বিদ্রূপ সে ছাড়েনি। তাই ও বলে, আপনারা গাড়ী চড়েন আর আমরা চাপা পড়ি এই বোধ নয় নিয়ম।

অশোক তবু সাড়া দেয় না। First Aid Boxটা খুলে ব্যাণ্ডেজ ও যন্ত্রপাতি বের করতে থাকে।

যন্ত্র দেখে ভয় পায় মেয়েটি। বলে, কি করবেন?

—কিছু না। অশোক কিছুতেই যেন বেশী কথা বলবে না আজ। তাড়াতাড়ি ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগাতেই সে ব্যস্ত।

ওষুধটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিণ্টু আর্তনাদ করে ওঠে।

মেয়েটির উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা যায়, কি দিলেন? ওর লাগলো যে?

অমন একটু লাগেই। অশোকের কণ্ঠে এতটুকু আন্তরিকতা নেই।

মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, লাগলে আপনাদের কিছু হয় না··· কিন্তু আমাদের লাগে বেশী।···কে ডেকেছে আপনাকে? আমরা ত কেউ ডাকি নি?

এলোমেলো ভাবে বলে ওঠে ও। কি করে যে ওর বিরক্তি প্রকাশ করবে ও ঠিক বুঝতে পারে না যেন।

—না ডাকলেও আমাদের আসতে হয় অনেক সময়ে। একই ভাবে জবাব দেয় অশোক।

—নিশ্চয়ই! দয়া করে উপকার করতে এসেছেন·· আপনারা ভাললোক গাড়ী চাপা দিয়েছেন এই খুব, আর কিছু দরকার নেই···মিণ্টু নিজের থেকেই ভালো হয়ে যাবে। কথাগুলো শোনাতে পেয়ে একটা পরম তৃপ্তির ছাপ ফুটে ওঠে পর মুখে।

অশোক ওর মুখের দিকে তাকায়। এতক্ষণে ওর কথা সত্যি সত্যিই শুনতে পেয়েছে সে। আঃ কেন গোলমাল করছো···আমার গাড়ী নয় বলছি!···

—নয়? তবে?

—দেখতে এসেছি ওকে! আমি ডাক্তার!

অশোক ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে থাকে।

—ডাক্তার! মেয়েটি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় একেবারে!

এমন সময়ে খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে বেরিয়ে আসে বৃদ্ধ ভূতনাথ পণ্ডিত। ডাক্তার কথাটা তার কানে গিয়েছিল। তাই সে সোজাসুজি বলতে থাকে, ডাক্তার! তা বেশ বাবা···এ ভালই হোল—! আচ্ছা ডাক্তার সায়েব, আমার নাড়িটে একবার দেখো ত বাবা—

বলতে বলতে ভূতনাথ তার শীর্ণ হাতখানা বাড়িয়ে ধরে। অশোক ওর মুখের দিকে তাকায়। বহু দুর্যোগে ভরা কোন অতীতের আকাশের মুখ দেখছে যেন সে।

ভূতনাথ আবার বলতে থাকে দম্ নিয়ে, হ্যাঁ বাবা আমাকে কি আর চিনতে পারবে? আমি সেই পুরনো ভূতনাথ। সবাই বলে ভূতো পণ্ডিত। হেঁ হেঁ, গাঁয়ের পাঠশালার আমি হেড পণ্ডিত ছিলাম কি না। ওই ত' অনুই বলুক না। বৃদ্ধ ঐ মেয়েটির দিকে ইঙ্গিত করে।

সেই অতীত দিনের স্মৃতির আলো পড়ে বৃদ্ধের চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

অশোক কিছু বলবার আগেই অনু বলে ওঠে, আঃ বাবা, কেন তুমি আবার চেঁচামিচি করছো। কতবার বলেছি তুমি যখন তখন বাইরে এসো না!

অনুর বিকৃতি কণ্ঠস্বরে অশোক যেন চমকে ওঠে। কেমন যেন বিব্রত হয়ে তাকায় ওদের দিকে।

মিণ্টু এদিকে বেশ একটু সুস্থ বোধ করছে। খুব বেশী যে তার লেগেছিল তা নয়। তবে অজ্ঞানের মত হয়ে গিয়ে ছিল ধাক্কা লেগে, আর আঘাতটা লেগেছিল পায়ে। এদিক ওদিক তাকাতেই মিণ্টুর নজর পড়ে অনুর হাতে অশোকের কোটটার দিকে। কোটের পকেটে দামী ফাউনটেন পেন আঁটা। বস্তির অল্প আলোর মধ্যেও চক্ চক্ করছে।

মিণ্টুর চোখদুটো চকচক্ করে ওঠে। বস্তির ছেলে সে। নিম্নস্তরের

জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা তার এই বয়সেই। এও সে শিখেছে বাঁচতে গেলে তাকে এমনি ধরণেরই হতে হবে। উপায় নেই, নগ্ন দারিদ্র্য মানুষের মনের সব হীনতাকে নগ্নরূপে মেলে ধরেছে চোখের সামনে। সেই হীনতার প্রলোভন বড় ভয়ানক।

আঘাতের ব্যথা ভুলে যাচ্ছে মিণ্টু। চোখের সামনে শুধু ফাউনটেন পেনটা। সকলেই এখন অন্যমনস্ক। মিণ্টু সে সুযোগ হারাতে চায় না। চোখের পলকে কোটের পকেট থেকে সরিয়ে ফেলে কলমটা!

কোন অতলের মাছ এক নিমিষে ওপরে ভেসে ওঠে, তারপর একটুখানি হাওয়া যেন চুরি করে টেনে নেয় ওপরের স্তর থেকে, এবং পর মুহূর্তেই তলিয়ে যায় টুপ করে। জলের নীচে যেটুকু নিশ্বাস নেওয়া যায় তাতে প্রাণ বাঁচে না। তাই মাঝে মাঝে উপরের স্তরে আসতে হয় বৈকি!

এদিকে ভূতনাথ থামে নি তখনও। আপন ঝোঁকে বলে চলেছে, ও, বাইরে আসবো না···কেন আসবো না শুনি! ডাক্তার কি তোর মিণ্টুর একার? দেখো ত' বাবা, আমি গাঁয়ের হেড পণ্ডিত···আমার কোনো দোষ ছিল না বাবা···বুড়ো বয়সে···এই ভ্যাখো বুকে কেমন যেন হাঁপ লাগে···

অনু আবার বাধা দিয়ে ওঠে। বলে, কেন তুমি বাজে বকছো বাবা!

অশোক বলে, আচ্ছা দেখছি আপনাকে—একটু সবুর করুন।

অদূরে কয়েকজন কৌতূহলী স্ত্রীলোক সমস্ত ব্যাপারটা সকৌতুকে উপভোগ করছিল। ওদের মধ্যে একজন ফিস্‌ফিস্ করে বলে, ছুঁড়ির আক্কেলটা দেখছো গা! বুড়ো বাপের রোগ হয়েছে, আমল দেয় না। আর ইদিকে কোন ইত্তিজাতের ছেলে কুড়িয়ে এনেছে, তাকে নিয়ে কি আদিখ্যেতা!

আর একজন চাপাকণ্ঠে জবাব দেয়, গা জ্বলে যায়!

এদিকে অশোক ভূতনাথকে পরীক্ষা করতে থাকে। ভালো করে দেখতে

সময় লাগে অনেক। দেখা শেষ করে বলে, অসুখ আপনার ভাল নয়। বেশ কিছুদিন ভোগাবে!

ভূতনাথের যেন কান্না পায়। ক্ষীণকণ্ঠে বলে, বাবা ভুগলুম ত' কম নয়। আরও ভুগবো? সারবে ত' ডাক্তার বাবু?

ওর ভিজে চোখে জীবনের আগ্রহ যেন জ্বল জ্বল করে ওঠে।

অশোক চিন্তিতস্বরে বলে, রোগ কি আর সারে না; তবে চেষ্টা করতে হবে।···তারপর অনুর দিকে ফিরে বলে, হাত ধোব একটু সাবান দাও।

অনুর বৌদি তারিণী এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সাবানের কথা শুনে ছিটকে বেরিয়ে আসে। ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে আর একজন স্ত্রীলোককে বলে ওঠে, শুনলে দিদি! আবার সাবান! পেটে ভাত জোটে না, বলে সাবান! কোন বেজাতের ছেলে কুড়িয়ে এনে আমার সোয়ামীর ঘাড়ে চেপেছে। ভাত দিচ্ছি, কাপড় দিচ্ছি, মাথা ছাপিয়ে উঠলো খরচ! কেন, অতবড় ধাড়ী মাগী রোজগার করে পেট চালাতে পারে না?

ব্যাপারটা কদর্য হয়ে উঠছে দেখে ভূতনাথ একটু যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ভদ্র অভদ্র বোধটা এখনও আছে। গলা বাড়িয়ে বলে, আঃ, বৌমা! তুমি চুপ কর। পেটের কথা সব মুখে আনতে নেই, চুপ কর তুমি!

অনু যেন বিস্ময়ে লজ্জায় একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। তারপর ধীরে ধীরে ঘটির জল অশোকের হাতে ঢেলে দেয়। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে ফেলে অশোক। যত শীগগির ব্যাপারটা চুকিয়ে দিতে পারা যায় ততই ভাল। ধোয়া মোছা শেষ করে অনুর হাত থেকে কোটটা নিয়ে গায়ে পরতে পরতে ভূতনাথকে বল্লে, আপনার জন্যে একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে অশোক পকেটের মধ্যে হাত ঢোকায় কলমটার জন্য। কিন্তু কলমটা নেই সেখানে! এক মুহূর্তের জন্যে অশোক বিচলিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু পরক্ষণেই বলে, আচ্ছা আপনার ওষুধটা পরে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু একটা কথা, মিণ্টুকে এখনই একবার হাসপাতালে পাঠানো দরকার।

অনু যেন চমকে ওঠে। বলে, হাসপাতালে কেন?

—পায়ের চিকিৎসা হওয়া চাই। ঘাটা বিষিয়ে যেতে পারে। অশোক চট্‌পট্‌ জবাব দেয়। ওর স্বরের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

—কিন্তু আমরা যে কিছুই চিনি না।

—চেনো না কি? এই ত' কাছেই হাসপাতাল। কিছু অসুবিধে হবে না। সোজা মিণ্টুকে নিয়ে ঢুকবে, সেখানে তারা সব ব্যবস্থা করে দেবে। এখনই নিয়ে যাও।

বলতে বলতে অশোক নিজেই এগিয়ে যায় তার চামড়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে। বেশীক্ষণ ওখানে থাকলে হাওয়াটা বিষিয়ে যেতে পারে। আবহাওয়ার ক্ষতটা এতই ক্লেদময়।

এগিয়ে যেতে যেতে অশোকের কানে আসে—ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি, ছুঁড়িটা কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে উঠলো।...মুখ ফিরিয়ে অশোক দেখলো—তারিণী। তারিণী তখনও অনুর উদ্দেশ্যে বলে চলে, তুই না হয় লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছিস, তাই বলে এটাও ত' ভদ্দর লোকের ঘর?

ওপাশ থেকে আর একজন স্ত্রীলোক যোগ দেয়। বলে, ডাক্তারকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই দেখলুম দিদি! ছেলে চাপা দিয়ে দেখছি শাপে বর হল।

ধীর অথচ কঠিন ভাবে এগিয়ে আসে অনু। তার স্বর অসম্ভব রকমের জোরালো। বলে, তোমরা চুপ কর, এটা নোংরা কথার জায়গা নয়!

একটু সময় নেয় তারিণী। তারপরেই মুখ ঝামটা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, চুপ করবো কেন লা? আমার সোয়ামীর পয়সায় তোর এত বড়মানষী ফলানো! ডাক্তার ডাকলি ওষুধপত্তর জোটাবি কোত্থেকে?

—তোমার একথার জবাব আমি দিতে চাইনে বৌদি!

ভূতনাথ এগিয়ে আসে ঝগড়া মেটাতে। অন্নুর দিকে তাকিয়ে বলে, ওইজন্যেই তোকে বলি, ছেলেটাকে আর কোথাও দিয়ে আয়···ওকে নিয়েই যত ঝগড়া···

—সে আমি বুঝবো বাবা। পাঁচজনের গায়ে পড়া উপদেশ আমি চাইনে। ···আমার অনেক কাজ···।

কথাটা ভাল করে শেষ না করেই অন্নু ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কথার শেষ দিকটায় মনে হল তার গলার স্বরটা বোধ হয় কাঁপছে। এ কাঁপা শুধু দুর্বলতার জন্যে নয়। এক এক সময়ে এমন হয় গলাটা একই সঙ্গে দৃঢ়তা ও দুর্বলতার জন্য কাঁপে। এ কাঁপা সেইজন্যেই।

যারা ঝগড়া করবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে এনেছিল তারা ঐ স্ত্রীলোকের দল এই হঠাৎ পরিণতি দেখে বলে, চল ভাই চল! বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর! বলতে বলতে ওরা বস্তির আঁকাবাঁকা পথে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অশোক এগিয়ে যায় আরও। রাস্তার ধারে তার গাড়ী অপেক্ষা করছে। কোনমতে বস্তির গলিটা পার হতে পারলেই হল। কিন্তু রাস্তায় পৌঁছবার আগে কলতলায় কয়েকজন স্ত্রীপুরুষের কলরব শুনে সে আর একবার থমকে দাঁড়ায়।

একজন স্ত্রীলোক অপর একজন স্ত্রীলোককে বলছে, ভারী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! অত গরম কেন লা? কল কি তোর একার?

অপরটি জবাব দেয়, আমার একার কেন হবে গো? তোমার সোয়ামীর পয়সার কল, তোমারই একচেটে!

তৃতীয় স্ত্রীলোক বলে, তুই কেন থাম না বাছা! ওই যাঃ আমার ভাত বুঝি পুড়ে গেল মা। একই সঙ্গে দুটি অসঙ্গত কথা একই ভাবে আশ্চর্যরকম বলতে পারে ওরা!···

প্রথম স্ত্রীলোকটি বলে, অমন যদি করিস, হাটে হাড়ি তোর ভাঙবো আমি।

দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি আগুন হয়ে বলে, ক্ষুদি মাসী, সাবধান বলে রাখচি কিন্তু—

স্ত্রীলোকেরা পরস্পর মারমুখী হয়ে ওঠে।

জীবনে যাদের উত্তাপ নেই তাদের এই নিত্য গরম হয়ে ওঠা।

অশোকের দৃষ্টির মত পা দুটোও যেন স্থির হয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। পাহাড়ের উঁচু মাথা থেকে সে দেখেছে নীচেকার সমতল জমিকে অনেকবার। কিন্তু সে দেখায় কোন বিশেষত্ব নেই। শুধু শ্যামল সবুজ বিস্তার—সে শ্যামলিমা বড় সুন্দর। কিন্তু আজ সে সমতলে নেমে দেখছে শ্যামল সবুজ মাটির বুকে মাঝে মাঝে গভীর পাঁক। সে পাঁকের দুর্গন্ধ অত উঁচু পাহাড় থেকে কোনদিন পাওয়া যায় না। সকলের চেয়ে বিস্ময়ের কথা যারা এখানকার নোংরার কাছাকাছি থাকে, জঞ্জালের মধ্যে যাদের জীবনযাত্রা, নালানর্দমার দিকে মুখ রেখে যারা পড়ে থাকে তারা আর ওরা—ঐ পাহাড়ের উঁচু দেশের লোকেরা—এই দুই জগতের লোকেরাই মানুষ!

শশধর চৌধুরীর প্রাসাদ থেকে শশধর চৌধুরীর বস্তিতে নেমে এসে অশোক আজ নতুন করে জীবনকে চিনেছে।

জড়িত পায়ে এগিয়ে যায় ও রাস্তার দিকে। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে একখানা পা খানায় পড়ে যায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্যাণ্টে ও জুতোয় নোংরা মাখামাখি হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি সামলে নেয় অশোক। কিন্তু তার আগেই একজন লোক সকৌতুকে বলে ওঠে, আঃ হা হা! একেবারে কাদা মাখামাখি! সামলে না চললে এখানে পা ত পিছলোবেই! বস্তি যে!

অপর একটি লোক যোগ দেয়, যা বলেছো, বড়লোকের পা কথায় কথায় পিছলোয়।

ছোট পুকুরে আবার ঢিল পড়ছে।

তাড়াতাড়ি পা ফেলে অশোক এগিয়ে যায় গাড়ীর দিকে।

মিণ্টুকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য অনু তার ফর্সা শাড়ীখানা বার করেছে। হ্যাঁ, শাড়ীখানা কথাটা ভুল নয়। শাড়ী তার একখানাই। একমাত্র সন্তানের মত বহু যত্নে ও বহুদিন ধরে অনু ওখানি গুছিয়ে রেখেছে। প্রয়োজন অল্পই আসে কিন্তু তবু জীবনের খাদ থেকে রাজপথের আলোয় কদাচিৎ যখন ভেসে ওঠবার প্রয়োজন আসে তখন বের করতে হয় শাড়ীখানা। নিজের শাড়ীখানার সঙ্গে সঙ্গে মিণ্টুরও একখানা জামা বের করতে হয়। অনেকদিন আগে ছোট ছোট কয়েক টুকরো কাপড় জোগাড় করে নিজের হাতে সে মিণ্টুর জন্যে একখানা জামা সেলাই করে রেখেছিল। সেটি বের করে মুখে হাসির রেখা টেনে এনে অনু বললে, দেখেছিস্ কেমন নতুন জামা? আয় পরিয়ে দিই তোকে!

মিণ্টুর দিকে হাসিভরা মুখে চাইতে গিয়ে অনু দেখলো মিণ্টুর মুখ হাসিতে উপছে পড়ছে। সে হাসি জামার আনন্দে নয়। মিণ্টু পরম আহ্লাদে বালিশের তলা থেকে কি যেন একটা বের করে বলে, এই দেখ দিদি!

অনু যেন সাপ দেখেছে এমন চমকে উঠলো। বললে, কোথায় পেলি এই কলম?

মিণ্টু হেসে নিল খানিকটা। বললে, কেন, ওই ত ডাক্তারবাবুর পকেটে ছিল!

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—অনুর কম্পিত আর্তস্বর যেন কেঁদে উঠলো। তোর মরণই ভাল ছিল মিণ্টু। তুই একেবারে কেন চাপা গেলি না হতভাগা! তোর জন্যে সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল।

শুধু স্বর নয় সমস্ত দেহটাই যেন অস্থির কাঁপছে। কম্পমান চোখের পাতা দুটো ভিজে আসে কান্নায়!

চলে যাওয়া অশোকের গাড়ীর চাকার শব্দের শেষ রেশটুকু তখনও হাওয়ায় কাঁপছে।

শুধু, জীবনের রাজপথে যে খাদ, সে খাদে অন্ধকার এতই ঘন হয়ে আসছে যে, ওপরের আলোর স্পর্শ পেয়ে সে এতটুকু টললো না।

কাঁপলো না পর্যন্ত!

রাত্তিরে অশোকের খাবার কথা ডলিদের বাড়ী। সেই যে খেলতে খেলতে চলে এসেছে অশোক তখনও ফেরে নি। ডলি একটা ফোন করে খবর নেয় অশোকের বাড়ীতে, অশোকের দিদি শোভার কাছে। কিন্তু শোভা খবর দেয় অশোক বাড়ীতে ফেরে নি তখনও পর্যন্ত। এলেই পাঠিয়ে দেবে।

পাশের ঘর থেকে হরিচরণ ডাক দেন শোভাকে। বলেন, কে ফোন করছিল রে?

হরিচরণ ওদের বাবা। মা মারা গেছেন অনেকদিন। মেয়ে শোভা বিধবা হবার পর থেকে বাপের বাড়ীতেই ফিরে এসেছে। শোভা হরিচরণ আর অশোক এই তিনটি নিয়েই সংসার!

শোভা জবাব দেয়, ডলি ফোন করছিল বাবা···

—কিছু বলছিল?

—হ্যাঁ, কি যেন একটা accident দেখে অশোক গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেছে···ওদের খেলা আজ মোটেই জমে নি—

Accident এর কথা শুনে হরিচরণ অনাবশ্যক ভাবেই যেন চমকে ওঠেন। ব্যস্ত হয়ে বলেন, অশোকের গাড়ীর কোন accident নয় ত?

—না বাবা, ও-রাস্তায় কি যেন হয়েছিল …। …অশোককে ওরা খুঁজছিল।

—হুঁ, অশোক রাত্তিরে ওদের বাড়ী খাবে শুনেছিলুম, না?

—হ্যাঁ, ওখানেই খাবে।

ওদের কথার মধ্যেই অশোকের গাড়ীর গুঞ্জন ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

শোভা বলে, ঐ অশোক এল বোধ হয়। বলতে বলতে এগিয়ে যায় বাইরের দিকে। অশোককে দেখে শোভা একচোট হেসে ওঠে। গায়ময় কাদা লেপ্টে আছে—অশোকের সে কি বিচিত্র মূর্তি! শোভা বলে, এ কি রে? এত কাদা।…এমন পদস্খলন কোথায় হল!

—সে আর বোল না দিদি। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে অশোক বলতে থাকে। গিয়েছিলুম এক বস্তিতে—

—বস্তিতে? কেন? রুগী ছিল বুঝি?

—না রুগী ঠিক নয়। বস্তির একটা ছেলে accidentএ পড়ে—

—আহা…কত বড় ছেলে? বেঁচে গেছে ত? এক নিমিষে শোভার মুখের হাসি যায় মিলিয়ে।

—হ্যাঁ, বেঁচে গেছে। তবে পায়ে লেগেছে বেশ…হাসপাতালে পাঠিয়েছি। নেহাৎ অনাসক্ত স্বরেই অশোক বলে যায় কথাগুলো।

শোভা বলে, ডলি ফোন করছিল…তোকে এখনই ওদের বাড়ীতে যেতে হবে…। তোর নাকি যাবার কথা এখুনি…নে কাপড় চোপড় বদলে নে…।

হরিচরণ এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। অশোক এগিয়ে যাচ্ছিল দেখে বলেন, তোমাকে আবার কি সেই বস্তিতে যেতে হবে?

—না, ওসব নোংরা লোকজনের ভেতর আর আমি যাচ্ছি নে। বিশ্রী সব জায়গা। অশোকের মুখটা কুঁচকে যায় বিরক্তিতে।

কাপড় বদলে গাড়ী নিয়ে বেরোতে দেরী হয় না বেশী। সোজা ডলির বাড়ীতে গিয়ে উঠলে এমন কিছু আর দেরী হয়ে যাবে না।

কিন্তু খানিকদূর এগিয়ে এসে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে ও। একবার করে ঘড়ির দিকে তাকায় আর গাড়ীটা থামিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে।

এবং শেষ পর্যন্ত ডলিদের বাড়ীর রাস্তা থেকে গাড়ী ঘুরিয়ে সোজা চালিয়ে দেয় হাসপাতালের দিকে।

ঘূর্ণি হাওয়ার বেগে বৃষ্টির ছাট একদিক থেকে বদলে যায় অন্যদিকে।

হাসপাতালে পৌছে অশোক দেখে অনু মিণ্টুকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। ব্যস্ত হয়ে অশোক বলে, এই যে কতক্ষণ?

—ঘণ্টা দুই হোল বই কি? শান্ত স্বরে বলে অনু চোখ নামিয়ে।

—দু ঘণ্টা! সে কি? অশোক চীৎকার করে ওঠে।

—আমরা গরীব···দু'ঘণ্টা কেন, সমস্ত রাত বসে থাকতে হলেও নালিশ নেই। ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে এই যথেষ্ট।

অতি নীচু স্বরে কথাগুলো বললে কি হবে, অশোকের মনে হয় তার ঐ উচ্চস্বরকে সে যেন গ্রাস করে ফেলছে। অপ্রস্তুত হয়ে অশোক বলে, আচ্ছা দেখছি। বলেই বেরিয়ে যায় ওখান থেকে। তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

ওখান থেকে সোজা emergency wardএ গিয়ে ঢুকে চেঁচামেচি স্বরু করে দেয় অশোক। কেন patientকে ফেলে রাখা হয়েছে বাইরে?

অচেনা লোকেদের অবস্থা ঐরকমই হয়ে থাকে হাসপাতালে, বিশেষ করে ঐ স্তরের লোকেদের। তাই অশোকের বিরক্তি দেখে মেডিকেল ছাত্ররা একটু যেন শশব্যস্ত হয়ে ওঠে। বলে, আপনি পাঠিয়েছেন···আমরা জানতে পারি নি স্যর···

—জানাজানির প্রশ্ন নয়···যে কোন case যখনই আসুক তোমাদের attend করা দরকার। Compound fracture হতে পারে, titanus হতে

পায়ে···তোমাদের দায়িত্বজ্ঞান থাকা উচিত, হাসপাতাল প্রধানতঃ গরীবের জন্যে···এ কথা মনে রাখা দরকার···

অশোক যেন আপনার ঝোঁকের মধ্যেই বলে চলেছে কথাগুলো। ওর গলা শুনে আরও অনেকে বেরিয়ে আসে। দুজনে তাড়াতাড়ি গিয়ে Stretcherএ করে মিণ্টুকে নিয়ে আসে ভেতরে। পেছনে পেছনে আসে অনু।

অশোক ওদের দিকে লক্ষ্যই করে না। যেমন বলে যাচ্ছিল তারই সঙ্গে জোর দিয়ে দিয়ে বলে, ওকে একটু carefully দেখো তোমরা। বলতে বলতে ঘড়ির দিকে একবার তাকায়। তারপর যেমন ঝড়ের মতন এসেছিল তেমন ঝড়ের মত বেরিয়ে যায় হল থেকে।

ঘূর্ণি হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট ক্ষণে ক্ষণে বদলায়।

অশোক স্টার্ট দেয় গাড়ীতে।

রায় বাহাদুরের বাড়ীর মজলিস জমে উঠেছে। অশোকের জন্যে শুধু অপেক্ষা! নাচ, গান, হাসি, গল্প একই সঙ্গে চলেছে। আজ আসর বেশ পরিপূর্ণ। সকলেই এসে পড়েছে যথাসময়ে—নিখিল, রুণ, সুশোভন, মিলি চাটুজ্যে, অণিমা এবং আরও অনেকে। ড্রয়িং রুমে চারদিকে ছড়িয়ে আর বিছিয়ে বসেছে ওরা। ওরা যেন কোন মহাসমুদ্রের বিস্তৃত বালুতট। সেই তটভূমিকে ঘিরে ঢেউয়ের চঞ্চলতা। ঢেউ ওদের অঙ্গে অঙ্গে, হাসিতে হাসিতে, কণ্ঠে কণ্ঠে।

ঘড়িতে টং টং করে ন'টা বাজার সঙ্গীত শোনা গেল। বহু দাম দিয়ে বহু কষ্টে সংগ্রহ করা এই ঘড়ি। অদ্ভুত এর ধ্বনি। যে সময় পার হয়ে চলে গেল সেটা খোঁচা দিয়ে না বেজে সঙ্গীতের মতই সুরে ছন্দে মর্মরিত হয়ে ওঠে। সময়কে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে ভোলাবার এই অপূর্ব কৌশল!

সুশোভন বলে, অশোকের আসতে দেরী হচ্ছে···

নিখিল বলে, আরে দেরী না করলে importance বাড়ে না।

—কি রকম ? প্রশ্নটা তোলে মিলি চাটুজ্যে ! প্রশ্নের চাপে ভুরু-দুটো বেঁকে যায় জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত।

—খুব সোজা কথা। সিগারেটে একটা ring করতে করতে নিখিল জবাব দেয়। আমি কখনও দেরী করি না (আড়চোখে একবার ডলির দিকে তাকিয়ে শেষ করে) তাইতো আমার আদর কম।

—যাই বল, আমাকে কিন্তু যেতে হবে অনেক দূর। হাত ঘড়িটার দিকে দুবার তাকিয়ে নিয়ে কোচের গর্ভ থেকে সুশোভন একটু সোজা হয়ে বসে।

—অসুবিধে কিছু নেই, আজকাল রাত্তিরে পথে আলো জ্বলে—ও কোণ থেকে অণিমার কণ্ঠ শোনা যায়।

—তুমি বোঝ না অণিমা। আলো জ্বলে সুবিধে হয়েছে বটে, তবে অসুবিধেও হয়েছে অনেকের। নিখিল কথাটা যেন লুফে নিয়েই হেঁয়ালী সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে।

—কেন ?

—আবার কেন ? আজকাল বন্ধুবান্ধবীরা একটু নিরিবিলি অন্ধকার পেলেই খুশী থাকে···মানে অনেকেরই প্রাণের কথা বলছি—

সকলের মুখে মুখে টুকরো হাসির গুঞ্জন শোনা যায়। চাঁদের আলোয় ছড়ানো চকমকি পাথরের টুকরো যেন জ্বলছে !

খানিক পরে ডলি গান জুড়ে দেয়। ডলি বরাবরই গায় ভাল। মিষ্টি মিণমিণে গলা মীড়ে মীড়ে কাঁপতে থাকে। আর সকলের কলরব স্তিমিত হয়ে আসে গান শোনবার জন্যে। ওদিকে রুণু গানের তালে তালে নাচ জুড়ে দেয় ঘরের কোণে পাতা কাশ্মীরী গালিচাটার ওপর। [illegible] কণ্ঠ [illegible] যে সুরের ঝর্ণা ঝরে সেই ছন্দ দোলায়িত হয়ে ওঠে রুণুর কটি [illegible]

দেহলতায়। রুণু আজ পরেছে একখানা দুধের মত শাদা মাইশোর সিল্কের শাড়ী। পাতলা নরম শাড়ীখানা তার শরীরের প্রতিটি দেহরেখাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। ঘষা কাঁচের শেড লাগানো আলোয় তার নৃত্যবিহ্বল দেহখানাকে দেখাচ্ছে চাঁদের আলোয় হাওয়ায় দোল-খাওয়া রজনীগন্ধার ডালটার মত।

স্বপ্ন জমে আসছে বেশ।

ঠিক এমনি সময়েই রায় বাহাদুরের স্ত্রী হেমনলিনী একটি ছোট চার চাকার গাড়ীতে চড়ে আসরের মধ্যে এসে হাজির হলেন। হেমনলিনীর দুই পায়ে বাত। এবং যবে থেকে তাঁর মনে হয়েছে তিনি বাতে পঙ্গু হয়ে এসেছেন তবে থেকেই এই চার চাকার গাড়ীর ব্যবস্থা।

এসেই চীৎকার করে উঠলেন তিনি।

—কই অশোক আসে নি এখনও? ন'টা যে কখন বেজে গেল। পায়ের ব্যথা বেড়েছে···আর এদিকে এত দেরী অশোকের?···আঃ রুণু নাচ একটু বন্ধ কর না মা!···আমার পায়ে এত লাগে! নাচ একটু বন্ধ কর··! কখন যে অশোক আসবে।

অগত্যা নাচ থামাতে হয় রুণুকে। সকলের দিকে ও অর্থপূর্ণ ভাবে তাকায় একবার। হেমনলিনীর কাণ্ড দেখে মুখ টিপে একটু হাসে। কিন্তু নাচটা এমন হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়ায় সকলেই যেন একটু বিষণ্ণ। যে স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগে তার মাঝে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলে যে অবস্থা হয় মনের সেই অবস্থা ওদের!

রজনীগন্ধার ডাল থেকে হঠাৎ ফুলগুলো যেন ঝরে গেল।

কাঁচা ব্যারিষ্টার নিখিল রায় আর কিছু না হোক খোঁচা দিয়ে কথা বলতে পারে মিষ্টি মিষ্টি করে। হঠাৎ ভাঙ্গা ঘুমের পর জড়ানো চোখে তাকানোর মত অস্পষ্টভাবে হেমনলিনীর দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, সামান্য খাওয়া

…এ কি আর অশোকের মনে থাকে? ওদিকে পৃথিবীসুদ্ধ রুগী তার জন্যে হাঁ করে রয়েছে।

হেমনলিনীর মনটা বিষিয়ে ছিল তাই খোঁচাটা বুঝতে দেরী হয় না। চাকার স্প্রীংগুলো একটু দুলিয়ে বলেন, তুমি ত সুবিধে পেলেই অশোককে খোঁচা দাও বাবা!…উঃ পা দু'খানা আবার ঝিনঝিনিয়ে উঠলো…। বলতে বলতে স্নেহ ও বিরক্তির মিশ্রণ করে এক অপূর্ব দৃষ্টিতে তাকান নিজের পা দুখানার দিকে।

নিখিল জবাব দেয় না। জবাব একেবারে দিত না কি না জানা যায় না, কারণ, সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে অশোক। ঘড়ির দিকে একবার নজর দেয় সকলে। ঘড়িতে তখন ন'টা বেজে তেরো মিনিট।

হেমনলিনী যেন চেয়ারের মধ্যেই নেচে ওঠেন তাঁর অতখানি শরীর নিয়ে। বলেন, এই যে, এলে বাবা অশোক! এত দেরী…একেবারে যে তেরো মিনিট বাবা… বেঁচে আছি কিনা দেখো আগে। বলতে বলতে মুখখানা অদ্ভুতরকম ম্লান করবার চেষ্টা করেন তিনি।

ব্যাপার দেখে অশোক সকলের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে। শুধু বলে, আজ আর রক্ষে নেই তোমার!

ডলি বলে, তেরো মিনিট দেরী…মায়ের কী না হতে পারতো এই তেরো মিনিটে! এত জোর দিয়ে বলে ও কথাগুলো তাতে বেশ বোঝা যায় যে তেরো মিনিটে কিছুই হতে পারতো না আসলে।

হেমনলিনী বলেন, ত্যাখো বাবা…শিগ্গীর ত্যাখো পা দুখানা, বেঁচে আছি এখনও… কিন্তু বাঁচবো কি না তাই বলো। চোখে তাঁর জল না থাকলেও এমন করে বলেন কথাগুলো তাতে বোঝা যায় গলাটা তাঁর ভিজে উঠেছে।

অশোক এগিয়ে যায় ওঁর দিকে। ধীরে ধীরে তাঁর পা দুটো পরীক্ষা

করে। অর্থাৎ পরীক্ষা করার ভান করে মাত্র। তারপর একটু নকল গাম্ভীর্য টেনে এনে বলে, এ যে নতুন উপসর্গ দেখতে পাচ্ছি।

—সে কি বাবা! হেমনলিনী আর নাচেন না, একেবারে স্থির হয়ে যান।

ডলি ওধার থেকে বলে, তোমার এই তেরো মিনিট দেরীর জন্যে আমরা সবাই তটস্থ।

অশোক ডলির কথার কোন জবাব দেয় না, ও জানে ওটা বলার কথা নয়, নেহাৎ কথা বলা মাত্র। হেমনলিনীর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলে, উপসর্গটা, বেশ দেখা যাচ্ছে…লক্ষণ ভালো নয়…অপনার এমন চমৎকার একটা অসুখ বড্ড তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাচ্ছে…

—আহা তাই বলো বাবা। মাথাটা দুদিকে দুবার দুলিয়ে হেমনলিনী উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।—বাতের ব্যামো যে কী কঠিন!

—হুঁ, বেশ আছেন…খুব ভালো আছেন আপনি, এত ভালো থাকলে এ বাড়ীতে হয়ত আমার দৈনিক চাকরিটে থাকবে না…

অশোক কথাটা শেষ করে ডলির দিকে তাকায়। ঐ তরফ থেকে জবাবও আসে। অন্যদিকে চেয়ে ডলি বলে, ভয়ের কথা সন্দেহ নেই।

অশোক কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রায় বাহাদুরের চটির আওয়াজে থেমে যায়, বলা আর হয় না। সুতরাং আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কাছে এসে হাজির হন তিনি।

ওঁকে দেখেই হেমনলিনী বলে ওঠেন, ওগো শুনছো, অশোক বলছে আমি নাকি বেশ ভালো আছি?

—তুমি ভালো থাকলেই আমরা বাধিত! টেনে টেনে বলতে থাকেন রায় বাহাদুর। অশোকের দেরীর জন্যে তুমি ত প্রায় আমাদের রসাতলে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলে! বাতের অসুখের কত সুবিধে…কত সুবিধে—চোখে দেখা যায় না…।

হেমনলিনী হঠাৎ আবার নেচে ওঠেন চেয়ারের মধ্যে। বলেন, ওরে ওমা রুণু আমি আজ বেশ ভালো আছি···অশোক বলেছে···তবে তুই বাকী নাচটুকু নেচে নে মা!

ওঁর কথায় এবার সকলেই উচ্চৈস্বরেই হেসে ওঠে।

রজনীগন্ধার ডালে আবার দোল জেগেছে।

রুণু সেনের পায়ে ঘুমুরের ছন্দময় ধ্বনি!

ঠুং···ঠুং···ঠুং···!

রিক্সার ঘণ্টা বাজছে একঘেয়ে তালে। বস্তির এক নিস্তব্ধ গলি দিয়ে রিক্সা করে ফিরছে রমানাথ। পুরো এক বোতল ধেনো মদ গিলে টঙ্ হয়ে বাড়ী ফিরছে। উলঙ্গ বস্তি জীবনের উলঙ্গ অভিসার! রমানাথ গান ধরেছে।—

'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী
(তোর) নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী!

তেরো নম্বর বস্তির রাস্তা ত' নয় যেন রসাতলে যাবার রাস্তা। বেসুরো বেতালা গান গাইতে গাইতে আর রিক্সাওয়ালার সঙ্গে ইয়ারকি দিতে দিতে রমানাথ এগিয়ে চলে।

ওপাশে বিনোদিনীর ঘরে আড্ডা জমেছে। আলুথালু বেশে নাচ জুড়েছে বিনোদিনী। ধেনো মদের বোতল এদিক ওদিক গড়াচ্ছে কয়েকটা। উগ্র গন্ধটা বাইরে থেকে পর্যন্ত পাওয়া যায়।

কে যেন বলে, আয় পাগলি···আজ আর এক পা-ও এখান থেকে নড়ছি নে বাবা···।

বিনোদিনী শুধু চোখ নয়, সমস্ত দেহটাকে অদ্ভুতভাবে বাঁকিয়ে বলে, [illegible]

রাত্তিরে এখানে থাকলে লোকে বলবে কি? আমি বুঝি তোমার জন্যে খোয়াবো?

—পাগল আর কি! তুই যে আমার মানিনী, মান খোয়াবি কেন? আয়···আয় আজ দুজনে মথুরা থেকে বৃন্দাবন দেখে নেবো···আর দেরী করিস্ নে, বুকের মধ্যে কেমন করে যে···

রিক্সা এগিয়ে চলে।

—এই রোখো রোখো···হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে রমানাথ। ব্যাটা, তুমি আমাকে অসৎ পথে নিয়ে যেতে চাও! জানিস ঘরে আমার ধর্মপত্নী! এই যে···এইখানে।

রিক্সাভাড়া মিটিয়ে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে এসে রমানাথ ডাকে—কোথায় বাবা? বলি কই গো···তারিণীচরণ?···

রমানাথের জড়িত কণ্ঠস্বর শুনে বেরিয়ে আসে তারিণী। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে রমানাথকে। এ তার রোজের অভ্যাস! রোজের দৃষ্টি!

গলার মধ্যে একটা কৃত্রিম কর্কশতা এনে বলে, পিণ্ডি গিলে আসা হয়েছে বুঝি?

—আরে ও কিছু না···পেট জ্বলছে···রান্না কতদূর? টলতে টলতে, রমানাথ দরজার খুঁটিটা খপ করে ধরে ফেলে। উৎকট একটা গন্ধ বেরোয় মুখ দিয়ে।

—রান্না? রান্না কোত্থেকে হবে শুনি? মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে তারিণী।

—শোন কথা! চাল আছে, ডাল আছে, উনুন আছে, তোমার ওই হাতীর গতর আছে···রান্না হবে না কেন? গলার মধ্যে ঝাঁজ দেখালেও রমানাথ ছোপ-পড়া দাঁত বের করে হি হি করে হাসে।

—তুমি চোখের মাথা খাও! আমি কেন গতর খাটিয়ে রাঁধতে যাবো [illegible] জন্তে? তোমার বোন পারে না?

—হ্যাঁ, তাত্ত বটেই…নিশ্চয়। ডাকো অন্তুকে…একটু ধমকে দিই…অন্তু…
…অন্তু…অন্তু কোথায়? অনাবশ্যক রকমের চীৎকার করে ওঠে রমানাথ!

—চুলোয়!

—চুলোয়! তুমি জানলে কেমন করে? গিয়েছিলে সেখানে?

—আ মর! তারিণী মুখ বাঁকিয়ে হাসি আর বিরক্তির একটা মিশ্রিত ইঙ্গিত দেয়।…দেখগে কোন ডাক্তারের হাত ধরে গেছে হাসপাতালে।

—হাসপাতালে? কেন?

—ছেলেটার পায়ে লেগেছে মোটরের খোঁচা…ডাক্তারের সঙ্গে কী গলাগলি তাই নিয়ে…আমি ওদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবো! সোমত্ত বয়েস হয়েছে…পেরাণে সখ আছে…গা-গতর খাটিয়ে পয়সা আনে না কেন? ঘরভাড়া দেয় কে? ভাত কাপড় জোগায় কে?

—হুঁ, কথাটা দাঁড়ালো…রান্নাবান্না হয়নি…

রমানাথ আর দাঁড়ায় না। চুলোয় যাক সব! এমন নেশাটা ছুটিয়ে দেওয়া যায় না। পুরণো গানের কলিটা আবার ধরে গলা ছেড়ে,—'তোর নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী! তনয়ে তারো তারিণী।' গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে রমানাথ গলি ধরে!

তারিণী, বলে আ মর! বলেই মুখ টিপে হাসে।

একটু এগিয়ে আসতেই হুটুর সঙ্গে দেখা। রমানাথের নেশাটা চন্ করে ওঠে।

হুটু বলে, এসো কাপ্তেন…আজ আর তোকে ছাড়ছি নে…আজ তুই মাইনে পেয়েছিস…পাঁচ সিকে পয়সা দে…

রমানাথ বলে, দোকান যে বন্ধ!

—দে না তুই…একেবারে স্বদেশী খদ্দর মার্কা এনে হাজির করবো! দোকান বন্ধ হলেও কি আর মাল কেনা আটকায় রে…! মুরুব্বির মুক্ত বলে হুটু।

এগিয়ে যায় দুজনে।

দুই

ভূতনাথ চেঁচিয়ে চলেছে বস্তির ঘরের জানালায় বসে বসে। ছেলেমেয়েদের যাকে দেখছে ডাকছে পড়বার জন্যে। চিরকাল পণ্ডিতি করে এসেছে গ্রামের পাঠশালায়। আর আজ এই জঘন্য বস্তির মধ্যে বসে বসে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। পড়াতেই হবে, লেখাপড়া শেখাতেই হবে এই ছেলেমেয়ে-গুলোকে। ভূতনাথ চেঁচায়, ওরে এই···এই ছেলেটা···আয় হতভাগা··· পড়া করবি আয়···

ছেলেরা বক দেখিয়ে পালায়।

—আবাগের বেটা, আমায় ঠাট্টা! রাগে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে ভূতনাথ—ভূতো পণ্ডিত! আপন মনে চেঁচিয়ে চলে, আমি পুরণো পণ্ডিত··· চিরকাল গাঁয়ের পাঠশালায় পণ্ডিতি করে এলাম···আর আমায় কি না ঠাট্টা, এ্যাঁ!

ছেলেরা কখন পালায় কথার ফাঁকে একটি মেয়ে এসে পড়ে। ওকে দেখে লাফিয়ে ওঠে ভূতনাথ, ওরে এই ছুঁড়ি—

—কেন? মেয়েটি চোখ কুঁচকে তাকায় ভূতনাথের দিকে।

—আয় শিগ্গীর···পড়া করবি আয়।

—ইঃ তোমার ভারি বিদ্যে···বিদ্যের বেস্পতি···

মেয়েটি আর দাঁড়ায় না। এগিয়ে চলে যায় নিজের কাজে।

—মরবি তোরা···চিরকাল দুঃখু পেয়ে মরবি।···একবার যদি ভালো হয়ে বসতে পারি···কান ধরে সবাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে ছাড়বো। আমাকে ঠাট্টা··· তোর বাপকে···তোর চোদ্দ পুরুষকে শেখাতে পারি···তা জানিস্?···

থক্ থক্ ঝাঁঝিয়ে ওঠে, যা যা…যেখানে যাচ্ছিস যা…ওরে আমার শাক্তা রে…

অনু তবু কিছু বলে না, এগিয়ে যায়। কিন্তু কিছু শুনতে না পেলে প্রাণ ছটফট্ করে তারিণীর। অগত্যা এক তরফাই বলে চলে ও,—ডাক্তার… ডাক্তার…ডাক্তার…বলি আনাগোনা ত' করলি অনেকবার, সুবিধে কিছু হল ?…

এই ইঙ্গিত অসহ্য। অনু ফিরে দাঁড়ায়। বড় ঝরণার মুখে এতটুকু একটা পাথরের চাঁই। জলে ঘূর্ণি ওঠে।

অনু বলে, আমার মাথা হেঁট হলে তোমার কিছু সুবিধে হয় বৌদি ?

—মাথা উঁচু আর রইলো কোথায় তোর ? ডুবে ডুবে জল খেতে সবাই পারে। কই সকলের সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি করে বল্ দিকি ?

অনু সাড়া দেয় না এ কথার। দৃষ্টিহীন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে তারিণীর মুখের দিকে।

তারিণী বলে চলে, তার চেয়ে স্বীকার পেলেই হয়…বড় লোকের সুনজরে কেউ পড়ে, কেউ পড়ে না…! কারু যদি ভাল হয় আমার ত' কই হিংসে হয় না ! বেশ ত ভায়ের ভাত কাপড়ে রয়েছিস, ডাক্তারের তপিল থেকে দু'পাঁচ টাকা সাহায্য ত করতে পারিস্ ? আমরা কি আর তোর পর !

ওদের কথা শুনতে আর দুটি স্ত্রীলোক কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বলে, এ ত' ঠিক কথাই ভাই ! তোর ত পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা…

সমর্থন পেয়ে তারিণী একেবারে বিগলিত হয়ে ওঠে। হাত ঘুরিয়ে বলে, বল ত দিদি, আমি বললেই যত দোষ !

অপর স্ত্রীলোকটি বলে, তাইতো বলি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছে নেই।

ওরা বেনোজল এক জায়গায় দাঁড়াবে না···তুই তোর খাল বিল ভরে নে না কেন?

অসহ্য! অনুর মাথার মধ্যে রক্ত চনচন করে। বলে, মেয়েদের সম্মান মেয়েরাই খোয়ায়···কিন্তু সব মেয়ে সমান নয়।

কথাটা শেষ করে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না ওখানে। বেরিয়ে চলে যায়।

ছোট হলেও পাথর! জলের ঘূর্ণিবেগে দাঁড়ানো যায় না। কথা জোগায় না আর ওদের তিন-জনের মুখে।

হাঁসপাতালে এসে অনু দেখলো মিণ্টুর সমস্ত ব্যাণ্ডেজ খোলা। একরাশ খেলনা নিয়ে বিছানার ওপর বসে বসে মিণ্টু নার্সের সঙ্গে গল্প করছে।

অনুকে দেখেই মিণ্টু চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললে, দিদি দিদি···এই দেখো কি সুন্দর খেলনা···

অনু একটু বিস্মিত হয়ে যায়। বিস্মিত হবারই কথা। বস্তির ছেলে মিণ্টু। যে কোনদিন একটার বেশী দুটো জামা গায় দেয় নি একসঙ্গে, জীবনে এরকম চকচকে নতুন দামী খেলনা দেখেছে কি না সন্দেহ সেই মিণ্টুর কোলে এতগুলো খেলনা···!···সচকিত আগ্রহে প্রশ্ন করে অনু, কোথায় পেলি এসব?

মিণ্টু বলে—ডাক্তার সাহেব—বলতে গিয়েই থেমে যায় দরজার দিকে চেয়ে। অনু ঘাড়টা কাৎ করে দরজার দিকে চেয়ে দেখলো অশোক ঢুকছে।

অনুকে দেখে অশোক তাড়াতাড়ি মিণ্টুর বিছানার দিকে এগিয়ে এল। মুখখানা তার হাসিতে জলজল করছে। অশোক বললে, আর কি, মিণ্টু ভালো হয়ে গেছে···আজকেই ছাড়া পাবে···তোমরা নিয়ে যেয়ো।

অনুর মুখে হাসি নেই কিন্তু। অশোকের চোখের ওপর তার দৃঢ় দৃষ্টি তুলে বলে, নিয়ে যাবো, কিন্তু খেলনাগুলো আপনি ফিরিয়ে নিন্…

—তার মানে? ভুরু দুটো কুঁচকে অশোক প্রশ্ন করে। প্রশ্ন করে অর্থাৎ প্রশ্ন দিয়ে এড়িয়ে যেতে চায় অনুর দৃষ্টিকে।

—আপনার এই বাজে খরচে হয়ত অনেকের প্রাণরক্ষা হত। মিণ্টু যেখানে থাকে সেখানে কেউ না খেয়ে মরে, কেউ রোগে ভুগে মরে—

—ও, তোমার বাবার কথা? তাঁর খরচ আমি দেবো।

অশোকের স্বর গম্ভীর হলেও, সেখানে যথেষ্ট অস্বস্তি আছে।

—হয়ত আপনি দেবেন। শান্ত দৃষ্টিতে আর শান্ত স্বরে বলতে থাকে অনু, …আপনার এই ছিটে ফোঁটা দয়া আপনার বিলাস!

—তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—গরীবের কথা আপনারা কোনদিন বুঝতে চান না। এতটুকুও দ্বিধা করে না অনু, ক্রমাগতই বলে চলে,—আপনারা খেয়াল খুশীতে তাদের দুটাকা পাঁচ টাকা দেন আর তারা আপনাদের বাহবা দিয়ে বলে আপনারা কত মহৎ, কত দয়ালু!

—দেখছি তুমি অনেক কথাই জানো। কিন্তু নিজেদের অবস্থার প্রতিকার করতে নিজেরা জানো না।

—জানি, মানুষকে খাওয়াতে পরাতে জানি, বাঁচাতে জানি, মানুষের মত করে বাঁচবার শিক্ষাও দিতে জানি কিন্তু অধিকার যাদের হাতে…তারা বড়লোক তারা ক্ষমতাবান…তাদের হাত থেকে শুধু সেই ক্ষমতা কেড়ে নিতে জানি নে।

নিজে যেন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে অশোক। অনু যদি কথাগুলো উত্তেজিত হয়ে বলতো তাহলে উত্তেজনার মুখে কিছু একটা বলা যেতো চড়া গলায়। কিন্তু আশ্চর্য, এমন শান্তভাবে এত চড়া পর্দার কথাগুলো বলে ঐ মেয়েটা যে জবাব খুঁজে পাওয়া যায় না। এক মিনিট সময় নেয় অশোক। তারপর

বলে, তাহলে শোনো, আমিও বলি! এও তোমার ভুল…আজ সব দেশে ক্ষমতাবানদের হাত থেকে গরীবরাই ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে…আমরা যদি নিতে না পারি…সে দোষ আমাদেরই।

—হ্যাঁ আমাদের অনেক দোষ…! যাই হোক, মিণ্টুর জন্যে আপনি অনেক করলেন…আমি সে কথা মনে রাখবো।

শুধু কথা নয় ওর স্বর শুনেও বোঝা যায় যে কথাটা ও শেষ করে দিতে চায়।

অশোক বললে, আমি যেটুকু করেছি সে আমার কর্তব্য। তার বেশী কিছু নয়!

কথা শেষ করে অশোক এগিয়ে চলে যায়। অনু ওর চলে যাওয়ার দিকে প্রশংসমান কৃতজ্ঞতায় তাকিয়ে থাকে।

—তিন—

জলপরীদের জলনৃত্য চলেছে। শুভ্র, নরম, নগ্ন দেহ জলের সঙ্গে যেন গলে এক হয়ে যাচ্ছে। ফেনা উঠছে জলে। বিন্দু বিন্দু জল চকচক করছে চুলের গোড়ায় গোড়ায়।··· নৃত্যের ঢেউয়ে যেন জলতরঙ্গের সঙ্গীত!

স্বপ্ন দেখছে ডলি জল পরীদের! স্বপ্ন নয় জাগ্রত কল্পনার নীল মোহ! মোজাইক করা বাথরুমে বাথটবের মধ্যে ডুব দিয়ে আছে ডলি চৌধুরীর নগ্ন দেহখানা। টবের এক কোণের কল থেকে সদ্য ঝরা জলে ফেনা উঠছে। আর ঐ ফেনার মত হালকা লাগছে নিজেকে ডলির। দেহটা যেন আর নিজের আয়ত্তের মধ্যে নেই। নগ্ন স্বচ্ছ জলের আলিঙ্গনে তার নগ্ন কোমল দেহটা আলগোছে ডুব দিয়ে আছে। ভাবতে ভাবতে কেমন শির শির করে ওঠে দেহটা। জলের ছোট ছোট ঢেউয়ের সঙ্গে তার বুকের মধ্যেও যেন ঢেউ ওঠে, ঢেউ দোলে দেহে মনে। নার্সিসাসের মত আপনার দেহ সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে যায় ডলি। গুন গুন করে গান গেয়ে ওঠে। জলতরঙ্গ বাজছে যেন! নিজের নগ্ন শুভ্র দেহ আর বাথটবের নগ্ন স্বচ্ছ জল এর মধ্যে আর কোনও আবিলতা নেই।···কেবল স্নানের আগে যে হেজলিনটুকু গায়ে মেখে এসেছিল ও সে হেজলিনটুকু গলে গলে পড়ে জলের মধ্যে। আর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাল-নীল জাল বোনে। জালগুলো পাক খায়। স্নানের আগে হেজলিন মাখা, তার অভ্যাস হয়ে গেছে। রুদ্র সেনের কাছে কথাটা প্রথম জেনেছিল ও, হেজলিন মেখে স্নান করলে স্নানের পর দেহটা সাদা হয়ে [illegible] আলো-পড়া জমাট বরফের মত! খানিক পরে আবার জলের [illegible]

ফেনার জলটা ঘুলিয়ে ওঠে। দেহটা অদৃশ্য হয়ে যায়। জলের আকাশে দেহটা নিয়ে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলে যেন!

স্নান শেষ করে উঠে আসে ডলি জলের আলিঙ্গন থেকে। গাটা ঝপ্ ঝপ্ করে মুছে নেয় নরম তোয়ালে দিয়ে। তারপর তোয়ালেটা আলগোছে দেহলতার ওপর জড়িয়ে নিয়ে বড় আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে ওকে, এই অসম্বৃত অর্ধাবৃত দেহে! দেহটা যেন খালি হয়ে হালকা হয়ে গেছে। জলের সঙ্গে মিশে মিশে অনেক কিছু যেন হারিয়ে এল সে। এমনি মনে হয় ওর। আর কণ্ঠ থেকে সুর ঝঙ্কার উঠতে থাকে খুশির হাওয়ায় গা ভাসিয়ে।

বাইরে দরজার কাছ থেকে ঝি এসে জানিয়ে যায় যে নিখিল আর রুমু এসে অপেক্ষা করছে।

তাড়াতাড়ি সাজ পোষাক সেরে ডলি বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় ড্রয়িংরুমে। ওকে দেখেই নিখিল একেবারে যেন লাফিয়ে ওঠে। বলে, এখনি পৌনে ছ'টা এর পর মেট্রোর টিকিট পাবো না ডলি।

—অপানি যে ঝড়ের আগে দৌড়ন। ডলি তার উজ্জ্বল দেহখানা ঈষৎ দুলিয়ে জবাব দেয়।

ডলিকে চোখ ভরে দেখতে দেখতে বলে নিখিল, উপায় নেই! কি জানো কথা দিয়ে কথা না রাখা আমার আসে না।...আমি কাঁটায় কাঁটায় appointment রাখি।

রুমু বলে, কই, অশোকবাবু এলেন না যে?

ডলি তাড়াতাড়ি জবাব দেয়। বলে, অশোক সিনেমায় যেতে পারবে না...। ওর সময় নেই...কাজের লোক...। এইমাত্র আমি ফোন করেছিলাম। শোভাদি সেই কথাই বল্লেন।

নিখিল বরাবরই খোঁচা মারতে পারলে সুযোগ ছাড়ে না। তাই এই

সুযোগে ডলির দিকে একটু বাঁকা ভাবে তাকিয়ে বললে, strange! কোন একটা আনন্দের ব্যাপারে অশোক কোনদিন সাড়া দেয় না।

—আমারও তাই মনে হয়। ডলিকে শুনিয়ে রুনু কথাটা বলে নিখিলের দিকে চেয়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা একটু সহজ করে দেবার চেষ্টা করে। বলে, of course I don't mean anything!

তবু ডলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একটু শুখনো গলাতেই বলে, নিখিল বাবু···আপনার এ কথা সত্যি নয়।

নিখিল একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। একটু সময় নিয়ে বলে, মানে তা নয় আমি ঠিক তা বলি নি···! তবে কি জানো appointment is appointment! কথার দামই সব চেয়ে বেশী। ঠিক যা বলেছি বুঝে নাও। অর্থাৎ ভদ্রলোকদের বিচার করি তাদের মুখের কথার উপর···মানে কথা দিয়ে কথা না রাখা···যখন তখন বাজে কথা বলা···আর বাজে কথার মানেই ত মিছে কথা ডলি!

—সে কথা ঠিকই বলেছেন বটে!

—তা হলেই দেখো। নিখিল উৎসাহিত হয়ে ওঠে। হেসে নেয় খানিকটা হো হো করা অবান্তর ভাবে। ইচ্ছেটা তার হালকা হাসি দিয়ে ব্যাপারটা হালকা করে নেয়।

এদিকে কান্নার রোল উঠতে লেগেছে বস্তিতে, ভূতনাথের ঘরে। হঠাৎ ভূতনাথের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে ভীষণ। মরতে বসেছে প্রায়! তারিণী, আন্থু, মিণ্টু এবং আরও অনেকে এসে জড় হয়েছে ঘরের মধ্যে।

তারিণী বলে, ওরে এই ছোঁড়া!

মিণ্টু সাড়া দেয় তাড়াতাড়ি, কি মামী?

—এঃ মামী! কলির কেষ্ট এলেন মামী বলে ডাকতে। প্রয়োজনের সময়েও তারিণী মুখ ঝামটা না দিয়ে কথা বলে না। হঠাৎ আবার বলে,

হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? বলে পর লাগে না পরে তেঁতুল লাগে আ জ্বরে······

মিণ্টু ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে শুধু।

তারিণী হাত নেড়ে বলে, যা না তোদের সেই ডাক্তারের কাছে··· পারিস্‌নে যেতে? এত ভালোবাসা···ডেকে নিয়ে আয় না কেন একবার··· বুড়ো যে মরতে বসলো···চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পাসনে?···

মিণ্টু অনুর দিকে তাকায়। অনুমতি পাবার জন্যে। বলে, যাবো দিদি?

অনু যেমন তাকিয়ে ছিল ভূতনাথের মাথার দিকে আর মাথা টিপছিল তেমনি অবস্থায়ই বলে, ডাক্তার এলে টাকা দিতে পারবো না মিণ্টু!···

তারিণী খোঁটা দিতে ছাড়ে না। বিকৃত স্বরে বলে, এর পরেও বুঝি তোর ডাক্তার টাকা চাইবে? এত মাথামাখি···এত দেখাদেখি···ভেতরে ভেতরে কত জিলিপির প্যাঁচ দেখলুম···

মিণ্টু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বাঁকা কথার অর্থ সব না বুঝলেও অনুর চোখের জলটা মিণ্টু বোঝে। বলে, আমি যাই দিদি।

এক দৌড়ে বেড়িয়ে আসে মিণ্টু রাস্তায়!

অশোকের চেম্বারে পৌছতে বেশী দেরী হয় না মিণ্টুর! এসে দেখে লোকের ভীড়! অশোক ভীষণ ব্যস্ত হয়ে একের পর এক রোগী পরীক্ষা করে যাচ্ছে আর ওষুধ লিখে যাচ্ছে। মিণ্টু শুনছে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছে অশোকের।

ভদ্রলোক বলছেন, ডাক্তারবাবু এই ওষুধটা পাওয়া যাচ্ছে না।

অশোক একটু যেন বিরক্ত হয়। বলে, কেন? এটাত বাজারে আছে!

—আছে, তবে আমাদের দেবে না। বলে পঁচিশ টাকা দাম!

—পঁচিশ টাকা! অশোক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়। চার টাকার বেশী কিছুতেই হতে পারে না। বার বার দেখতে দেখতে কনট্রোলড রেট সব মুখস্থ হয়ে গেছে ওর!

ভদ্রলোক একই ভাবে বলে চলেন, দোকানে গিয়ে দাঁড়ালুম প্রথমে বললে নেই! বললুম কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন বললে অন্য জায়গা থেকে আনিয়ে দিতে পারি তবে দাম বেশী পড়বে। পঁচিশ টাকার কম নয়। জিজ্ঞেস করলুম রসিদ দেবেন ত? পাশের লোকটি বোধ হয় মনে করলো আমার কোন মতলব আছে, তক্ষুনি বললে না স্তর এ ওষুধ পাওয়া যাবে না···বিলেত থেকে এখনও মাল এসে পৌছায় নি।

অশোক চুপ করে থাকে সাড়া দেয় না কোন রকম। এরকম কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে আজকাল। প্রথম প্রথম রাগ করতো এখন করে না। এ ধরণের কারবার যারা বন্ধ করতে পারে তারাই আছে এর মূলে। এ সত্যটা আবিষ্কারের পর থেকে এর প্রতিকার সম্বন্ধে সব আশা ছেড়ে দিয়ে অশোক নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছে।

ভদ্রলোক হয়ত আরও কিছু বলতেন এবং শেষ পর্যন্ত কিছু বলাতেন অশোককে দিয়ে। কিন্তু হঠাৎ সবাইকে ঠেলেঠুলে মিণ্টু এসে দাঁড়ায় অশোকের সামনে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ডাক্তার সাহেব আমি এলুম।

মিণ্টুর কণ্ঠ থেকে খুব খানিকটা আত্মীয়তা আর খুব খানিকটা নির্ভরতা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। এই ছেঁড়া-ময়লা জামা পরা ছোট-লোকের-ছেলেটার হাবভাব দেখে আর সকলে একটু যেন হকচকিয়ে যায়। অবাক হয়ে একবার মিণ্টুর আর একবার অশোকের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

অশোক কাজ করছিল। বলে, বাধিত হয়েছি···কি চাই বল···

মিণ্টু ঘটা করে ডাক্তার সাহেবকে নমস্কার জানায়। অশোক লক্ষ্য করেছিল সেটা। একটুখানি হেসে বলে, হঠাৎ ভব্যতা শিখলি কোত্থেকে রে?

—দিদি বলে দিয়েছে। ডাক্তার সাহেব একবার এক্ষুনি চলুন জ্যেঠামশায়ের—

—চুপ্ চুপ। এখানে চেঁচাতে নেই। আমি কোথাও যেতে পারবো না। এখন সময় নেই রে।…

—কিন্তু জ্যেঠামশায়ের খুব অসুখ যে।

—বেশ ত, অন্য ডাক্তার আছে ডেকে নিয়ে যা।

অন্য একজন ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উপদেষ্টার মত বলে ওঠেন, উনি অনেক বড় ডাক্তার—যেখানে সেখানে উনি যান না…তা ছাড়া ওর অনেক টাকা ফী…তোরা দিতে পারবি নে।

মিণ্টু যেন গুটিয়ে যায় দেহে মনে। আমতা আমতা করে বলে জড়িত স্বরে, আপনি যাবেন না? বড় ডাক্তাররা বুঝি গরীবের ঘরে যায় না?

কী স্পর্ধা! ধানি লঙ্কার ঝাল ত! সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকে। ছোট-লোকের এত বাড় হয়েছে আজকাল। আশোককে কি বলে একটু তুষ্ট করতে পারবে তাই ভাবতে থাকে আসলে। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কায় কিছুই জোগায় না!

অশোক অম্লান মুখে বলে, এসব কথা তোকে শিখিয়ে দিয়েছে না মিণ্টু?

মিণ্টু অশোকের সহজ কথায় ভরসা পায়। এই রকম সহজ স্বরে অশোক অনেক কথা বলেছে মিণ্টুর সঙ্গে হাঁসপাতালে, তাদের বস্তিতে।… মিণ্টু বলে, আপনি চলুন এক্ষুণি আপনাকে যেতেই হবে।

অশোক বলে, তোর জ্যাঠা বাঁচবে না রে…আমি গিয়ে আর কি করবো বল্ ত?

মিণ্টু বলে, বা রে, বেশ ডাক্তার আপনি ত···রুগী না দেখেই অমনি বলে দিলেন বাঁচবে না?

—আঃ ভালো বিপদে ফেললি তুই, মিণ্টু···আবার সেই তোদের বস্তির হট্টগোল···যাক্ দাঁড়া একটু।···

অশোক তাড়াতাড়ি করে কয়েকটা কাজ সেরে নেয়। তারপর সকলের বিস্মিত দৃষ্টির অরণ্যের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে গিয়ে চাপে। মিণ্টুও গাড়ীর মধ্যে একপাশে গিয়ে বসে। স্টার্ট দেয় অশোক গাড়ীতে।

পথের মধ্যে অশোক মিণ্টুর সঙ্গে আলাপ করতে থাকে। এতদিন সে দেখছে মিণ্টুকে, তার পরিচয় পাবার কৌতুহল হওয়া তার স্বাভাবিক। তাছাড়া সে এ কথাও শুনেছে যে মিণ্টু নাকি অন্নুর আপন ভাই নয়।

অশোক বলে, তোর মা বাপ কোথা রে মিণ্টু। প্রশ্নটা করে একটু যেন অপ্রস্তুত বোধ করে অশোক। ছোট ছেলে হয়ত কি মনে করে বসবে।

মিণ্টু কিন্তু বিচলিত হয় না। সহজ ভাবেই বলে, বাপ নেই মা আছে।

—মা কোথায়?

—সেই যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল···মা আমাকে ওই বস্তির ধারে ঘুম পাড়িয়ে কোথায় চলে গেছে।

—তোর দিদি?

—ওরা আমার কেউ না। দিদি শুধু আমাকে লুকিয়ে ভাত দিত। দিদির জন্যেই ত থাকি—নৈলে এদ্দিন পালিয়ে যেতুম।

অশোক দেখে মিণ্টুর চোখ দুটো জলে ভরে আসছে। অশোক আর কিছু বলে না।

খানিক পরে মিণ্টু ডাকে, ডাক্তার বাবু?

—কেন রে? বল্ না কি বলবি?

মিণ্টু চুপ করে থাকে। কি যেন বলতে চায় পারে না। চোখে তার তখনও জল। সজল মেঘ থম থম করে আকাশে। ঝরে না।

মিণ্টু আবার ডাকে, ডাক্তার বাবু!

—বল্ না। ভয় পাচ্ছিস কেন? কিছু চাস?

—না।

—তবে?

মিণ্টু তার ছেঁড়া জামাটার পকেটের মধ্যে হাত ঢোকায়। তারপর সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসে ঝকঝকে একটা কি!

অশোক অবাক হয়ে দেখে তার সেই ফাউনটেন পেনটা।

মিণ্টু মাথাটা নীচু করে বলে, এটা আমিই নিয়েছিলুম আপনার পকেট থেকে···আমি আর এমন কাজ করবো না ডাক্তার বাবু!···

সোণার ক্লিপ আঁটা ফাউনটেন পেনটা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে। আলো ত নয় যেন খোঁচা দিচ্ছে চোখে বিদ্যুতের মত!

বিদ্যুতের চাবুক পড়ে মেঘের গায়ে। মেঘ ঝরে জল হয়ে।

মিণ্টু কাঁদছে!

রীতিমত একটা বড় বিস্ময় অশোকের জীবনে!

ঢিল পড়লে ঢেউ ওঠে পুকুরের জলে আবার বৃষ্টির ফোঁটাতেও ঢেউ ওঠে!

অশোক বলে, চুপ কর্ মিণ্টু কাঁদিস নে। এ দোষ তোর নয় মিণ্টু··· তোদের যারা নীচে নামিয়ে রেখেছে এ দোষ তাদের···

অশোক বাঁ হাত দিয়ে মিণ্টুর পিঠটা চাপড়ে দেয়।

মিণ্টু কাঁদছে তখনও। একবার বর্ষা স্থুরু হলে মেঘের পর মেঘ কোথা থেকে যে এসে জোটে তার ঠিক নেই। মিণ্টু তাই কাঁদে, কলমটা নেবার দিন যত হেসেছিল তার থেকেও বেশীক্ষণ ধরে কাঁদে ও।···

বৃদ্ধ ভূতনাথ শেষ বারের মত নিশ্বাস টানছে! হাঁ করে হাঁপাচ্ছে সে।

শুধু নাক দিয়ে নয় মুখ দিয়েও যতটা পারে হাওয়া টানবার চেষ্টা করে ও। বিষাক্ত হলেও হাওয়া ত বটে।

ঘরের মধ্যে অনু আছে, তারিণী আছে, আর কয়েকজন স্ত্রীলোকও এসে জুটেছে। একধারে বসে বসে বিড়ি টানছে রমানাথ, নিতান্ত বুড়ো বাপের দিকে চেয়ে বসে থাকবার ধৈর্য তার নেই। তাই আপন মনে ধোঁয়া ছাড়ছে আর তার দিকে বোকার মত দৃষ্টি মেলে দেখছে।

একজন স্ত্রীলোক তারিণীকে বলে, ক্রমশই ত খারাপ হয়ে আসছে দেখছি।

তারিণী তাড়াতাড়ি জবাব দেয়। বলে, আমরা ত' অনেক করলুম···তুমিই বলো দিদি···পাকা ফল খসে পড়বে···তার জন্যে কেঁদে কেটে লাভ কি? তুমিই বলো ভাই!

—সে ত বটেই দিদি। মাথাটা ঈষৎ কাৎ করে জবাব দেয় স্ত্রীলোকটি।··· তবু কুকুরটা বেড়ালটা···তার জন্যেও লোকে হা হুতোশ করে বই কি?

সকলে চুপ করে থাকে, কোন কথা কয় না। বুড়ো হয়েছে ভূতনাথ। শুধু গিলতে পারে আর খ্যাঁক খ্যাঁক করে কাশে। মরলেই বা কি আর বাঁচলেই বা কি! তবু নিতান্ত কুকুর বেড়ালের সঙ্গে তার তুলনা করাটা—

কিন্তু তবু অনু কিছু বলে না। চুপ করে বসে থাকে মাথার কাছে। আর রমানাথের বিড়ির আগুনটার দিকে আলগোছে তাকায়!

মাঝে মাঝে ভূতনাথ ভুল বকে। কিছুক্ষণ পরে পরে প্রলাপ বকুনী চলে। রোগের বিকারের মধ্যেও ভূতনাথের পাঠশালার স্মৃতি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। মুখে মুখে ভূতনাথ ছেলে পড়িয়ে চলেছে।···আয় আয় পড়া করবি আয়··· পালাচ্ছিল যে? কিচ্ছু হবে না তোদের চিরকাল দুঃখ পাবি।···আরে পাঠশালা পালিয়ে পেয়ারা বাগানে ঢুকেছে হতভাগা!···জানিস্ আমি এ গাঁয়ের হেডপণ্ডিত···জানিস্ আমি সর্বস্ব বেচে এই পাঠশালা করেছি ···তোরা মানুষ হবি···লেখা পড়া শিখবি···হতভাগা···বদমায়েস···

অনু থামাতে চেষ্টা করে ভূতনাথকে। বলে, বাবা—একটু চুপ করো··· আমি আর পারি নে···

এরই মধ্যে অশোককে সঙ্গে করে মিন্টু এসে হাজির হয়। কাউকে কিছুই বলতে হয় না, অশোক নিজেই এগিয়ে এসে পরীক্ষা করে ভূতনাথকে।

রমানাথ এইবার মাতব্বরী করতে আসে। বিড়িটা তার শেষ হয় নি তখনও। সেটা টানতে টানতেই কথা বলে অশোকের সঙ্গে। সমীহ করে না একটুও। বলে, দু'দিন থেকে অবস্থাটা খারাপ মনে হচ্ছে।

সম্পূর্ণ-ই অবান্তর কথা। অশোক শুধু বলে, হুঁ।

অনু বলে, দুদিন থেকে খালি ভুল বকছেন। আগে ত' এমন ছিল না?

অনুর কথা শুনে রক্তবর্ণ চোখ করে ভূতনাথ তাকায় অনুর দিকে। চীৎকার করে বলে, শোনো কথা, হেডপণ্ডিত আমি···আমার ভুল ধরতে এসেছে···তোর চোদ্দ পুরুষকে আমি শেখাতে পারি জানিস্?···

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে ভূতনাথ। কনুয়ের ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করে।

অনু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে নামিয়ে দেয় মাথাটা।

ডাক্তারের কথা শুনে বহু লোক এসে ভীড় করেছে ঘরটার মধ্যে। নোংরা ময়লা কাপড় পরা লোকগুলো অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায় অশোকের দিকে। সে যেন কোন অন্য রাজ্যের জীব। তাদের নোংরা গা আর নোংরা কাপড় থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়। সমস্ত জড়িয়ে হাওয়াটা কেমন অস্বচ্ছ আর ভারী হয়ে ওঠে। অস্বস্তি বোধ করে অশোক। অনুর দিকে ফিরে বলে, এর পর ওষুধ ধরবে কি না বলা কঠিন···অবশ্য ওষুধ আমি পাঠাবো···।

অনু বিস্মিত হয়। কৃতজ্ঞতায় ভার ওঠে বুকখানা। ধরা গলায় বলে, আপনি বলছেন—। বলতে গিয়ে সময় নেয় ও। অশোক ওকে শেষ

করবার সুযোগ না নিয়েই বলে ওঠে, হ্যাঁ বহুদিন আগে থেকে চিকিৎসা করালে হয়ত এ অসুখ এতদিনে সারতে পারতো।

অনুর চোখের তারা আর গলার স্বর একই সঙ্গে কাঁপতে থাকে। কোনও রকমে বলে, তবে কি বাবা বাঁচবেন না ?...

অশোক কি বলবে ? সত্যি জীবনের আশা নেই ভূতনাথের। তবু মুখ ফুটে সে কথা বলা যায় না। সে দেখেছে বাড়ীর মধ্যে একমাত্র অনুই যথার্থ চিন্তিত ভূতনাথের জন্যে। তারই মুখের ওপর এই শক্ত কথাটা কিভাবে উচ্চারণ করবে সে। তার থেকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া ভাল। অশোক ইতস্তত করে।

হঠাৎ বস্তির অপর এক দিক থেকে একটা কান্নার রোল ওঠে। মড়াকান্না শুনে চমকে ওঠে অশোক। মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে বসে বসে সেই মড়াকান্নার রোল আরও যেন বীভৎস হয়ে ওঠে।

ব্যস্ত হয়ে অশোক বলে, কাঁদছে কোথায় ? কি হল কি ?

—ও কিছু না—ওপাশ থেকে নিতান্ত উদাসীনের মত জবাব দেয় রমানাথ—কদিন থেকে এখানে মড়ক লেগেছে কি না !

—মড়ক ! অশোক সচকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায় ! অদূরে দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড এক প্রাচীর পত্র জ্বল জ্বল করছে। তাতে বড় বড় অক্ষরে নানা রকমের রঙ্ দিয়ে লেখা "কলিকাতায় বসন্তের মহামারী—অবিলম্বে টিকা লউন।"

অশোকের হাসি পায় এত দুঃখের মধ্যেও। যারা বেঁচে মরে আছে, যাদের বেঁচে থাকা মানে শুধুই মরে না যাওয়া তাদের আবার সাবধান করে দেওয়া মড়কের বিরুদ্ধে ! আগে হলে এই প্রাচীর পত্রে সে যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করতো। আস্থা রাখতো এ ধরণের প্রচার কার্যে। কিন্তু আজকাল ওদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার পর থেকে তার মত বদলাচ্ছে।

তবু ডাক্তার সে। মড়কের বীভৎসতা সম্বন্ধে ধারণা আছে তার। তাই হাজার হলেও মড়কের কথা শুনে চমকে ওঠে।

অনু বলে, মড়ক ওদের বন্ধু! ওরা বেঁচে মরে থাকে···মড়কে ওরা মরে বাঁচে!

আশ্চর্য, এত দুঃখের দিনেও অনু খোঁচা না দিয়ে ছাড়ে না। অশোক কিন্তু বিরক্ত হয় না একটুও। মিথ্যে বলে নি অনু।

এমনি সময়ে দরজার কাছে কাকে যেন দেখা যায়। বস্তির মালিক রায়বাহাদুর শশধর চৌধুরীর গোমস্তা হরিপদ এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক মাসের ভাড়া বাকী পড়ে গেছে ভূতনাথের। তাই সময়ে, অসময়ে তাগাদা না দিলে চলে না। সময় হলেই একবার করে এসে দাঁড়ায় হরিপদ। চেঁচামিচি করে, অপমান করে। যার যা কাজ।

ঘরের মধ্যে ভীড় দেখে হরিপদ আর বেশী দূর এগোয় না। দরজার কাছ থেকেই চেঁচায়—কই গো হেড্ পণ্ডিতের মেয়ে আজ আর ফিরিয়ে দিয়ো না বাছা। দু'মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী ফেলেছো···টাকাটা এইবার চুকিয়ে দাও। গড় গড় করে বলে যায় হরিপদ। এবং আরও যে বলবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রমানাথ উঠে আসে ঘরের ভেতর থেকে। ভাড়াটা তাকেই গুণতে হবে, অনুকে নয়। তাই উঠে গিয়ে বলে, দুমাসের ঘরভাড়া···বাবা কখন মারা যায় তার ঠিক নেই এই সময়ে ঘরভাড়ার দাবি করতে এলে হরিপদ?

রমানাথের লাল লাল চোখ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বাবা মারা যাবার চিন্তা তার নয়। মারা গেলে যে খরচাটা বের করতে হবে সেই ভেবেই তার মাথা গরম হয়ে উঠেছে। তার ওপর আবার এই ঘরভাড়ার তাগিদ!···

হরিপদ ছাড়বার পাত্র নয়। কদিন ধরেই সে ঘুরে যাচ্ছে। আজ রমানাথকে সামনা সামনি যখন পাওয়া গেছে তখন দু'চার কথা না শুনিয়ে

দিলে নয়। একটু গলা চড়িয়ে হরিপদ বলে, তোর বাবা মরছে আজ ছুমাস ধরে···যে ঘরে মরবে সেই ঘরের ভাড়াটা চুকিয়ে না দিলে চলবে কেন? আমি রায়বাহাত্বরের কাছে কি জবাবদিহি করি বল দেখি?

কথাটা মিথ্যে নয়। আজ ছুমাস ধরে ভূতনাথের মর মর অবস্থার দোহাই দিয়ে হরিপদকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। তাই রমানাথ একটু থতমত খেয়ে যায়।

কে যেন পেছন থেকে বলে, ওমা দেখো একবার রকমখানা চোখের চামড়া নেই গা এ্যাঁ? স্ত্রীলোকের কণ্ঠ বটে তবে তারিণী নয়।

অনু এবার উঠে আসে। নিজের হাতের চুড়ি ছুগাছা নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, আজ আপনি দয়া করে যান্···কাল যেমন করেই হোক আপনি টাকা পাবেন। শান্ত ভাবেই বলেও কথাগুলো। অপমানে ক্ষোভে আর লজ্জায় বস্তির আলোতেও তার মুখখানা লাল দেখায়।

হরিপদকেও স্বর নামাতে হয় অনুকে দেখে। কিন্তু তাহলেও তম্বি করতে ছাড়ে না। বলে, যখনই আসি তখনই বল কাল দেবো···কাল আর আসে না! তোমরা ভদ্দরলোক তাই কথা কাল দেবো!

'ভদ্দরলোক' কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করে যে তার থেকে সহজভাবে ছোটলোক বলা ছিল ভাল। রমানাথ খেঁকিয়ে ওঠে, এই হরিপদ, যা মুখে আসে তাই বলিস?

—তুই থাম্ তোর বোনের সঙ্গে কথা বলছি···ভারি মুরোদ তোর!

—মুখ সামলে কথা বলিস হরিপদ···সাবধান! রমানাথ খালি গায়েই আস্তিন গোটানোর ভান করে। মারামারির পূর্ব লক্ষণ ওটা। হয়ত কিছু একটা ও করে বসবেই আজকে।

ওধার থেকে তারিণী গজ গজ করতে থাকে রমানাথকে উদ্দেশ করে। বলে, সাউখুড়ি করে তুমি কেন যাও হাত উচিয়ে? থানা পুলিশ হলে

বোন তোমার রক্ষে করবে? গায়ে পড়ে যারা ভালোই করতে আসে, তাদের বলো না কেন দশ বিশ টাকা মুঠো আলগা করতে! ওঃ অমন ঢের দেখেছি।

কটাক্ষটা যে কাকে উদ্দেশ করে তা বুঝতে কষ্ট হয় না কারও। অশোক এগিয়ে আসে এবার দরজার দিকে। এগিয়ে এসে গম্ভীর ভাবে বলে, রায়বাহাদুরকে তুমি বলো···এ বাড়ীর যিনি কর্তা তিনি মারা গেলেও ঘর ভাড়ার টাকা মারা যাবে না। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর তুমি এদের অপমান করো না হরিপদ।···

অশোককে দেখে চমকে ওঠে হরিপদ মনে মনে। নরম হয়ে বলে, আজ্ঞে ডাক্তারবাবু আপনি? আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি···আমি সামান্য গোমস্তা বৈ ত নয়!

হরিপদ তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। যেন কিছুই হয় নি।

রমানাথও সরে পড়ে। ঘরের মধ্যে বসে থাকবার ধৈর্য আর তার নেই।

অনু ঘরে এসে ঢোকে। তার চোখে জল তখনও চক চক করছে। অশোকের দৃষ্টি তা এড়ায় না। মনটায় কোথায় যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। অনুর দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বলে, তোমরা কেমন করে সহ্য করো?··· মনুষ্যত্বের এই অপমান?

অনেক বড় বড় কথা মনে আসে অশোকের। অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করে। কেন জানি না ঐ বস্তির মেয়েটার চোখের জল কেমন যেন পীড়া দেয়। নেহাৎ অনিচ্ছাসত্বেও কিছু বলতে ইচ্ছে করে অশোকের।

অনু চুপ করে শোনে। পাহাড়ের ওপর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া নামছে সমতল মাটিতে। মাটি ঠাণ্ডা হচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিকীর্ণ করছে তার বুকের উত্তাপ।

অনু বলে, প্রতিবাদ জানাবার জায়গা আজো খুঁজে পাই নি, তাই সহ্য হয়ে যায়।···বলতে কষ্ট হয় অনুর তবু বলে যায় কথাগুলো।···

অশোক কথা বলবার সুযোগ খুঁজছিল। অনুর উত্তর পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, জীবনটাকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়তে পারো না? অন্তত আর কিছু না হোক এই বস্তিটারও ত কিছু উন্নতি করতে পারো?

অনু অল্প অল্প হাসে। মেঘের ও রৌদ্রের খেলা চলছে আকাশে। সমতলমাটির বাধামুক্ত বিস্তীর্ণ আকাশ!···

অনু বলে, আপনারা থাকেন ওপর তলায়···দুটো মুখের কথা বলে যেতে পারেন সহজে! যারা নীচে পড়ে গিয়েছে তারা জানে তাদের মাথায় কত বোঝা কত দুঃখের গুরুভার!

অশোক বিব্রত হয়ে পড়ে। নিজের কথাগুলো নিজের কাছে আগুনের মত শোনাচ্ছিল অথচ এই মেয়েটা এক কথায় উড়িয়ে দিল!···

সমতলভূমি থেকে দূরের পাহাড়কে কত ছোট দেখায়!···

অশোক আরও জোর দিয়ে বলতে চেষ্টা করে—কিন্তু মানুষ এত নোংরায় ডুবে থাকতে পারে···আগে আমি জানতুম না!

অনু এবার জোর করেই হাসে। বলে, আপনি বড় লোক, বিলেত ফেরৎ···মোটর ছাড়া পথে চলেন না···আপনি আর কি করে জানবেন? মানুষ আরও অনেক নোংরায় ডুবে আছে···মাঝে মাঝে মোটর থেকে নেমে তাদের দেখে যাবেন···নইলে কোন দিনই চোখে পড়বে না।··

সমতল থেকে পাহাড়ের দিকে যখন হাওয়া বয় সে হাওয়া বড় গরম লাগে।

অশোক বোঝে এর থেকে মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়া ভাল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে ও ঘর থেকে।

অনু তখনও হাসছে কি না কে জানে?

পুকুরের ঢেউ জেগেছে আবার! অবিশ্রান্ত ঢেউ!

—চার—

রায়বাহাদুরের বাড়ীর ড্রয়িং রুমে আসর বসেছে। জানলার ধারে বড় ইজি চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে রায় বাহাদুর ধূমপান করছেন। তাঁর পাশে দু'খানা কোচে নিখিল আর ডলি।

রায় বাহাদুরের মুখে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। আর সেই ধোঁয়ার মতই হালকা আলোচনা চলছে ওদের মধ্যে। এটা-ওটা!

কথায় কথায় অশোকের কথা ওঠে। আগে হলে অশোকের অনুপস্থিতি কল্পনা করা যেতো না। আর এখন অশোক নিয়মিতই অনুপস্থিত থাকে। সকলে সেটা বোধ করলেও বিশেষ কিছু বলে না।

সব বদলে যাচ্ছে। যে অশোক ছিল ওদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী দুরস্ত আদবকায়দায় হাবভাবে, সাজপোষাকে সকল বিষয়েই যে নিখিল রায়ের মত কাঁচা ব্যারিষ্টারকেও চমক লাগিয়ে দিতো সেই অশোক নাকি আজকাল নোংরা বস্তির মধ্যে আনাগোনা করছে। কি যে সে পেয়েছে তার মধ্যে সেই জানে। যত সব নোংরা ছোটলোকদের আড্ডা! ভাবতে গেলেই শিউরে ওঠে গাটা।

তবু নিখিল অশোককে সমর্থন করেই কথা বলে। এভাবে বলার উদ্দেশ্য ডলিকে শোনানো ছাড়া কিছুই নয়!

বেশ সহজ সুরেই বলে নিখিল রায়বাহাদুরকে, ধরুন অশোক যদি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায়, আপনি বাধা দিতে গেলে সে মানবে কেন? তা ছাড়া কি জানেন মিঃ চৌধ্রি, সে ডাক্তার, তার নিজেরও একটা রুচি বোধ আছে।

—কী বলছেন আপনি? ডলির কণ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।···বাবা কি তার কোন কাজে বাধা দেন?

—না ঠিক তা নয়, তবে ধরো অশোকের ডাক পড়েছে খুব খারাপ জায়গায়···তাকে যেতেই হবে it's a doctor's duty···তাকে ধরে রাখা চলবে না!

রায়বাহাদুর এতক্ষণে জবাব দেন। বলেন, আমরা তাকে ধরে রাখতে চাই কে বললে তোমাকে?

—Sorry, বোধ হয় আমিই ঠিক বোঝাতে পারি নি···মানে, আমি বলতে চাই আপনি চান যে আপনার পছন্দসই জায়গা ছাড়া সে আর কোথাও যাবে না।···

ডলি নিজের থেকেই জবাব দেয়। বলে, বাবা তার ভালোর জন্যেই বলেন নইলে—। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই ডলি চুপ করে।

—এমন হতে পারে, আপনাদের পরামর্শ সে পছন্দ করে না—মানে বুঝলেন মিষ্টার চৌধ্রি, এটা হল এযুগের individualism···

রায়বাহাদুর অত সহজে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তিনি তাঁর যুক্তি দিয়ে চলেন, শোনো নিখিল, তুমি ঠিক বুঝতে পারো নি। অশোক বড় ডাক্তার, তার আত্মসম্মান অনেক বড়···বস্তিতে তার আনাগোনা কেউই পছন্দ করবে না···ওতে আমাদেরও মান থাকে না···।

—কিন্তু সে যদি আপনার অবাধ্য হয়?

—তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

কথাটা হয়ত আরও গড়াতো। কিন্তু মাঝে পথে বাধা পড়ে যায়। ওদিক দিয়ে হরিপদ এসে ঢোকে। হরিপদর মুখ বিষন্ন। এইমাত্র সে বস্তি থেকে ঝগড়া করে ফিরছে।

ঘরে ঢুকেই হরিপদ সুরু করে দেয় তার বক্তব্য। বলবার জন্যই সে

তৈরী হয়ে এসেছিল। নেহাৎ অশোকের খাতিরে সে রমানাথের চোখ রাঙ্গানী মুখ বুজে সহ্য করে চলে এসেছে। তা না হলে কি হত বলা যায় না। ব্যাপারটা রায়বাহাদুরকে জানিয়ে রাখা ভাল।

হরিপদ বলে, বড়বাবু আপনার বস্তির ভাড়া যদি ঠিক মত আদায় করতে না পারি তাহলে আপনি আর আমায় রাখবেন কেন?

—ব্যাপারখানা কি? ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করেন রায়বাহাদুর।

—ভাড়া আদায় করতে গেলেই দেখি, হয় মরেছে আর না হয় মরতে বসেছে···নয়ত রাতারাতি পালিয়েছে! আপনাকে বলে দিচ্ছি বড়বাবু··· আপনার কথাই ঠিক···বস্তির কখনও উন্নতি করতে নেই। ওরা ওই যে নর্দমায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে···ওইতেই ওরা বেশ থাকে। আস্কারা দিলেই বুঝলেন বড়বাবু···ফোঁস করে ওঠে।

—কোন বস্তিটার কথা বলছো তুমি? এতক্ষণ শোনবার পর প্রশ্ন করেন রায়বাহাদুর।

এতক্ষণ বকবার পর এই প্রশ্ন শুনে হরিপদ মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে। একটু গলা উঁচিয়েই বলে, আঁজ্ঞে আপনার ঐ ১৩ নং বস্তিটা! ওখানে যেন দল বেঁধে সব বেয়াড়া লোকগুলো বাসা নিয়েছে। সেই-যে বুড়ো হেড পণ্ডিত···আপনার মনে আছে বড়বাবু?

—সে আবার কি করলে?

—সেই একই কথা। হাতমুখ নেড়ে ভঙ্গিমা করে বলতে থাকে হরিপদ।···ভাড়া চাইতে গেলেই তার হাঁপানি ওঠে···দম্ আটকায়। আজ এক মাস ঘোরাচ্ছে বড়বাবু। ওর সেই মেয়েটা কি আর ভাড়া দেবে? সে ত কেউটে সাপ! কাছে গেলেই ফোঁস করে ওঠে। রমানাথটা শুদ্ধু আমায় তেড়ে আসে মারতে। আপনি যদি বলেন বড়বাবু সেপাইদের কিছু খাইয়ে কালই ওদের উৎখাত করে দিই!

—আগে একটা নোটিশ দাও। নিতান্ত গম্ভীরভাবেই বলেন রায়বাহাদুর! উত্তেজনার লেশটুকুও প্রকাশ পায় না তাঁর স্বরে।

—নোটিশ! ওদের আপনি বেশ ভাল করেই জানেন! সেই মেয়েটা নাকি আবার শুনছি বস্তির লোক জড় করছে আপনার বিরুদ্ধে!

ডলি একটু উৎসাহ বোধ করে মেয়েটার সম্বন্ধে। বলে, কে মেয়েটা? নাম কি?

—অনু বলেই ত ডাকে···অনুপমা-টমা হবে।

নিখিল একটু শ্লেষ করে নামটা নিয়ে। বলে, ওই হোল···যার উপমা নেই—অর্থাৎ viciousness without example!

হরিপদ নিখিলের কথায় কান দেয় বলে মনে হয় না। ডলিও না, নিখিল নিজেই হাসে বলতে বলতে।

হরিপদ দু'পা এগিয়ে যায় রায়বাহাদুরের দিকে। তারপর একটু নীচু সুরে সকলের দৃষ্টি ভাল করে আকর্ষণ করে বলে, মেয়েটা কেন জোর পাবে না বলুন বড়বাবু···আপনার এ বাড়ীর ছোঁয়াচ থেকেই ছুঁড়িটা আজকাল আস্কারা পাচ্ছে যে—

—তার মানে? ভারী গলায় প্রশ্ন করেন রায়বাহাদুর।

—মানে—হাত কচলাতে কচলাতে বলে হরিপদ—যদি সাহস দেন ত বলি। ছুঁড়িটা বশীকরণ জানে বড়বাবু। আমাদের ডাক্তারবাবুকে—অশোকবাবুকে মেয়েটা হাত করেছে স্বচক্ষে দেখে এলুম বড়বাবু—

চেয়ারের মধ্যেই চমকে দুলে ওঠেন রায়বাহাদুর! তাঁর চুরুটের আগুনটা নিভে আসছে···।

কথাটা বিশ্বাস করা অসম্ভব না হলেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না আর সকলের। চট্ করে বাধা দিয়েও কিছু বলা যায় না। এমনি একটা অস্বস্তিকর অবস্থা।

নিখিল কথায় হঠবার নয়। বলে, খুব স্বাভাবিক মিষ্টার চৌড্রি, আলোর ঠিক নীচেই অন্ধকার।

ডলির সহ্যের সীমা হারিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুব্ধ ভাবে বলে ওঠে ও,—আপনি একটু চুপ করুন দয়া করে—

নিখিল শুধু 'Sorry' বলে চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে ডলির চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেয় নিজেকে।

এমন সময়ে চার চাকার ঠেলাগাড়ীতে চড়ে হেমনলিনী এসে আসরে অবতীর্ণ হন। ঠেলাদারকে ধমকে বলেন, আঃ তোকে বলি অত হেঁচকে ঠেলা দিসনে! বুকে হাঁপ লাগে।···

হেমনলিনী এসে পড়াতে ব্যাপারটা থামা পড়ে যায়। হরিপদ বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

হেমনলিনী দেখতে পেয়েছিলেন হরিপদকে। তাই বলেন, ওই দুর্মুখটা এসে কী লাগাচ্ছিল বলো ত? ওকে দেখলেই আমার পায়ের ব্যথা বাড়ে!

নিখিল জবাব দেয়। বলে, কিন্তু ভাগবৎ গীতায় আছে—Sorry মহাভারতে আছে দুর্মুখরাই সত্যি খবর দেয়।

ডলি এ সুযোগ ছাড়ে না। চট্ করে নিখিলকে আক্রমণ করে বসে। বলে, মহাভারতের কোন পর্বে আছে নিখিলবাবু?

—কেন দণ্ডকবনের পর্বটায়। অম্লান বদনে বলে দেয় নিখিল।

সকলে হেসে ওঠে কোলাহল তুলে। আর তারই মাঝে হেমনলিনীর বিরক্তি ধ্বনিত হয়ে ওঠে—আঃ তোমরা চেঁচিয়ো না···আমার পায়ে লাগে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কথা তোমরা কেউ শুনছো না! সব গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছো।···বলছি যে ডলি অশোকের বিয়েটা আগেভাগে সেরে দাও—! মেয়ে জামাই নিয়ে কিছু দিন আমোদ আহ্লাদ না করলে আমার পা কিছুতেই সারবে না!···

নতুন প্রসঙ্গ ওঠায় সকলেই চুপ করে যায়। ঘরের মধ্যে কোথা থেকে একটা চড়াই পাখী এসে ঢুকে কিচিরমিচির করছিল ডলি সেইদিকে একমনে কি যেন দেখতে থাকে। নিখিল প্যাণ্টের ক্রীজ ধরে অকারণে টানাটানি স্থরু করে দেয়।···

জবাব দেন রায় বাহাদুর। বলেন, কিন্তু অশোক যদি তাড়াতাড়ি একাজে রাজি না হয়?

—শোন কথা। গালে হাত দিয়ে বলেন হেমনলিনী।—তার চেয়ে তাড়াতাড়ি হরিচরণ বাবুর কাছে একবার যাচ্ছ না কেন? অনেক দিনের ত পুরানো বন্ধু!···যত সব গণ্ডগোল, আমার পা আর সারবে না···

—বেশ তাই যাবো। বলতে বলতে উঠে পড়েন রায়বাহাদুর! এখুনিই যেন যাচ্ছেন।

নিখিলও উঠে পড়ে। তারপর 'good bye' বলে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। এগোতে গিয়ে ম্যাটিংয়ের দড়ি লেগে হোঁচট খায় একবার, তারপর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

—পাঁচ—

নদীর চলার পথে মরুভূমির মত ধূ-ধূ করা শুখনো মাটির মাঠ। সেই মৃত্যুর মত শূন্য মাঠ পেরিয়ে নদী এসে সাগরের সামনে দাঁড়ায়।

ভূতনাথের মৃত্যুর মধ্যস্থতায় অনু আর অশোক অনেকখানি কাছাকাছি সরে এসেছে। ওদের বস্তির ঘরের অদূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা কথা কয়। অনু আর অশোক। পিছনে ভূতনাথের শূন্য ঘরটা খাঁ খাঁ করছে। সেখানে ভূতনাথ নেই আরও অনেকেই নেই। বস্তির ভেতরকার হাওয়া যেন বিষ ছড়াচ্ছে। সে হাওয়া যে টানবে মরবে সে-ই।

সে-হাওয়ার মধ্য হতে একটু সরে দাঁড়িয়েছে ওরা। অশোক আর অনু।

অশোক বলছে, তোমার বাবার মৃত্যু হঠাৎ হয় নি। তিনি মারা যাবেন একথা তোমরাও জানতে· ·আমিও জানতুম!

অনু ও কথাটার সোজাসুজি জবাব দেয় না, দিতে পারে না বলে। শুধু বলে, আমি আর মিণ্টু যেখানেই যাই আপনার উপকার মনে রাখবো।

অশোকও কথার সুর বদলায়। অনুকে একটু শোনাবার জন্যেই বলে, অবস্থার কাছে যারা হার মানে, তারাই সব ফেলে পালায়—

অনু বিচলিত হয় না একটুও। সাহস করেই মুখের ওপর বলে, দেখুন আপনার কথায় আমি জোর পাইনে। আপনারা বাইরের লোক, আপনাদের উপদেশ ফাঁকা কথায় ভরা···আপনারা বস্তিতে মানুষ হন নি, বস্তির অপমান মাথায় তোলেন নি···

কথা ত নয় যেন ধারালো ছুরি। অশোকের মনে হয় তার সমস্ত যুক্তি

কেটে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ও বলে ওঠে, আচ্ছা ধরো, তোমাদের কাজে আমি যদি কিছু সাহায্য করি!

অনু হাসে। অনুর সেই বিচিত্র অনুচ্চারিত, অস্পষ্ট হাসি। হাসির মধ্যে অনেক খানি কান্না আবার অনেকখানি উত্তাপ যেন লুকানো। হাসতে হাসতে বলে অনু, বাইরের সাহায্য! এখানে সেই সাহায্য কোন কাজে লাগবে আপনি মনে করেন?

—কেন? একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করে অশোক। তার টাকা আছে নাম আছে, ডাক্তার হিসেবে হাতযশ আছে। সে নিজের থেকে সাহায্য করবে বলে এগিয়ে গেল অথচ ঐ মেয়েটা তা গ্রহণ করলো না, উড়িয়ে দিলে একটুকরো হাসি দিয়ে!

অনু বলে, যা আমরা পাইনি কোনদিন···পাবার আশা করিনে···তেমন সাহায্য হঠাৎ এসে পৌছলে লোকে সন্দেহ করবে, ভাববে এর মধ্যে আর কোনও মতলব আছে।

কথাটা শেষ করে এক বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকায় অনু অশোকের দিকে।

অশোকের মনটা যেন হালকা হয়ে আসছে। বলে, তুমিও কি সন্দেহ করবে?

—হ্যাঁ, আমিও সন্দেহ করবো। যা পাবার নয় তা যদি না চাইতেই আসে··· তবে আমি কেন, সবাই সন্দেহ করবে!

অনুর স্বর অন্যরকম! এ যেন অনু নয়, অন্য কেউ কথা বলছে।

—কিন্তু আমি যদি নিঃস্বার্থভাবে সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়াই? আবেগের মুখে বলে ফেলে অশোক।

অনু আবার হাসে। বলে, তার জন্যে আমার অনুমতি চাইছেন কেন? বেশ ত' লোকজন জড়ো করে ঢাক পিটিয়ে বলুন, আমি বস্তি উদ্ধার করতে এসেছি! শুনহ মানুষ ভাই···বলুন না কেন?

—হুঁ, দরকার হলে বোকাদের মাঝখানে গিয়ে সে রকম কথাও রটাবো! যাদের কাজ করতে যাবো তারাই ত' সকলের বড় বাধা। অবাক হয় অশোক মনে মনে। রাগও হয়। আশ্চর্য এই মেয়েটা, জোর করে মনের ভেতর থেকে গরম গরম কথাগুলো বের করে নিয়ে ছাড়বে। দরকারী কথায় এমন ভাবে হাসে যে রাগ হয়ে যায়!

অনু অশোকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জোরে জোরে হেসে ওঠে। বলে, আপনাকে এমন ভূতে পেলো কেন? কাজ নেই কর্ম নেই হঠাৎ গরীবদের উপকার করার সখ্! এ সখ্ আপনার কতদিন থাকবে? আপনার ঐ মোজা জুতো, কোট প্যাণ্ট, টুপি, কথায় কথায় মোটর গাড়ী এখানকার লোকে এসব ঘন ঘন দেখলে আপনাকে দানো দত্যি মনে করে ভয়ে পালাবে!...

—অর্থাৎ তোমার সাহায্য একেবারেই পাবো না, এই বলছ? অশোক সত্যি সত্যিই এবার রাগ করেছে। সব সময়েই তার এই সাজ পোষাকে আর মোটরগাড়ী নিয়ে খোঁটা দেওয়া।...রাগ করলেও অশোকের কণ্ঠে কোথায় যেন দুর্বলতার সুর।...

—আমার সাহায্য! প্রথমতঃ আপনি বস্তিতে ঢুকলেই ত' একদল কুকুর ডাকাডাকি আরম্ভ করবে...তারা দেখবে আপনি ভয়ানক নতুন লোক, আপনি কিম্ভূত কিমাকার—আমি ত ঘরে খিল দিয়ে ত্রাহি মধুসূদন করবো— বলতে বলতে অনু তার হাতের মুঠো দুটো বুকের কাছে জড় করে তার সেই 'ত্রাহি মধুসূদন' ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে আর হাসে।

—বেশ ত, তোমাদের এখানে অন্তত একটা নতুন কিছু হবে। রাগের ভাব দেখিয়ে বলে অশোক। রাগ করতে ভাল লাগছে তার।—সে নাই হোক তোমাকেও কিছু কিছু কাজের ভার নিতে হবে, আমি দরখাস্ত পাঠিয়েছি...লোকজন শিগগীরই এসে পড়বে...আমার এ্যাসিসট্যাণ্টরা এসে এখানে একটা ওষুধের দোকান খুলবে।—

—দেশশুদ্ধ লোক ওষুধ আর অসুখের কথাই বলছে···কিন্তু খেতে না পেলে যে অসুখও সারে না, ওষুধও ধরে না একথা বলছে না কেন ?

—খেতে যদি না পাও, কেড়ে খেতে পারো না কেন ? বিলেতে দুর্ভিক্ষ হয় না, কেন জানো ?—সেখানকার লোক খাবার না পেলে লুটপাঠ করে খেতে জানে। তারা শুধু মার খেয়ে মরে না। তারা মরবার আগে মেরে মরে।···

বলতে বলতে অশোকের ঠোঁট দুটো বীরত্বের গর্বে কাঁপতে থাকে। দুবছর আগেকার সব স্মৃতি জল জল করে ওঠে মনে। কেড়ে খেতে দেখে নি ও ওদেরকে···কিন্তু চোখ ভরে দেখে এসেছে ঐশ্বর্যের সমারোহ। পিকাডেলি··· ব্রিষ্টল···সব যেন ভীড় করে আসে চোখের সামনে।···

অনু আরও বেশি করে হাসে। হাসি ত নয় হাসির আগুন ! অনু বলে, আপনার কথা শুনলে হাসি পায়। একটা জাতের শরীর থেকে আড়াই শো বছর ধরে রক্ত শুষে নিয়েছে···তারা বরং ফুটপাথে খাবারের দোকানের তলায় পড়ে না খেয়ে মরে তবু হাত বাড়িয়ে লুঠ করে খাবার শক্তি খুঁজে পায় না।

—তাই বলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবো তুমি বলতে চাও ? ঝড়ের মত বলে অশোক কথাগুলো ! মনে মনে সেও হাসে এইবার। অশিক্ষিত বস্তির মেয়ে revolution এর তাৎপর্য বুঝবে কি করে ! অথচ ডলি কত সহজে বোঝে ওর কথাগুলো। কি ও বলতে চায়।

অনু যে ওকে বোঝে নি তা নয়। অন্ততঃ ওর শেষের কথায় তাই মনে হয়। ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে চট্ করে ও বলে, না তা বলিনে, তার চেয়ে বরং দু'শিশি ওষুধ এখানে খেতে দিয়ে যান···দুটো টাকা দান করে যান্··· কিছু কাজ হবে। তারপর গরীবের লোভ বেড়ে ওঠবার আগেই সুখ্যাতি আদায় করে গা-ঢাকা দেবেন, পথ খোলাই আছে ! দেখতে দেখতে খবরের কাগজে বড় বড় হরপে নাম উঠবে ! বলবে মস্ত বড় দেশ নেতা—বলবে দেশের প্রাণের বন্ধু···

আশ্চর্য, অনু এবার হাসছে না একটুও। মুখটা তার অদ্ভুত রকমের শুখনো।

অশোকের ভাল লাগছে। হাসির মধ্য দিয়ে অনেক দূরে সরে যাচ্ছিল সে। বিষণ্ণতার মাঝ দিয়ে এগিয়ে আসছে।

মৃত্যুর মধ্যস্থতা দিয়ে তাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে।

তাই এ বিষন্নতারও মূল্য আছে অনেক!

অশোক বলে, তুমি ঘা দিয়ে দিয়ে যদি আমাকে ভেঙ্গে তৈরী করো আমার আপত্তি নেই।

অশোক আর দাঁড়ালো না সেখানে।

পাহাড়ের উচ্চতা থেকে নীচের সমতল মাটিকে বড় সবুজ দেখায়। প্রাণের ঢেউ-খেলানো সবুজের রোমাঞ্চ!

—ছয়—

রায়বাহাদুর সেদিনই এসে হাজির হয়েছেন হরিচরণবাবুর বাড়ীতে। হেমনলিনী বলেছে ঠিক। ডলি অশোকের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা ভাল। হরিচরণবাবু অনেকদিনের বন্ধু তাঁর। কথাটা একবার পাড়তে পারলে অন্যথা হবে না।

হরিচরণবাবু আপন মনেই বসেছিলেন। হাতে একখানা বই ছিল বটে কিন্তু পড়ায় মন ছিল না। রায়বাহাদুরকে আসতে দেখে বর্তে গেলেন।

—আরে শশধর যে এসো এসো···মেঘ না চাইতেই জল!···

—তা বটে, তবে জলটা প্রায় চোখের জলে এসে ঠেকলো···তারপর কেমন আছো? রায়বাহাদুর আর একখানা চেয়ারে গা এলিয়ে দেন।

—যেমন তোমরা রেখেছো পাঁচজনে। হাসিতে মুখটা ভরিয়ে বলেন হরিচরণ। ভাবটা এই যে মন্দ আর কি? শাঁসে জলে আছি বেশ!

—পাঁচজনে তোমাকে ভালই রেখেছে ভায়া···তবে আমার ঝামেলা পাঁচ রকমের···তুমি বিপত্নীক হয়ে বসে দিব্যি বয়েসটা একরকম কাটিয়ে দিলে। কিন্তু আমি যে ভায়া আমার বেতালা গিন্নীকে নিয়ে নাজেহাল হচ্ছি···তার কি করি বল দেখি?

চিন্তায় মুহ্যমান হয়ে বলেন রায়বাহাদুর। আসল কথাটা একেবারেই পাড়া যায় না। খানিকটা ভনিতার দরকার বই কি! গোড়ার থেকে ভেবে চিন্তেই এসেছেন তিনি আজকে।

হরিচরণও একটু চিন্তিত হয়ে বলেন, বৌঠান আজকাল আছেন কেমন?

—বেশ দিব্যি আছেন! একটা সুবিধাজনক বাতের ব্যামো নিয়ে বহাল

তবিয়তেই আছেন···চারচাকার ঠেলাগাড়িতে চড়ে বাড়ীময় বোঁ বোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

রায়বাহাদুরের কথার রকম দেখে হরিচরণ হাসেন। বলেন, তা ঠেলা-গাড়ীখানা তুমি নিজে ঠেললেই পারো! বলে নিজের কথায় নিজেই হেসে উপভোগ করতে থাকেন।

—তা হলেও ত বাঁচতুম! কিন্তু তিনিই যে আমাকে ঠেলাঠেলি করছেন। না হাসলেও রায়বাহাদুরের গলা বেশ নরম হয়ে আসে।—এই ছাখো না ঠেলে পাঠালেন তোমার এখানে···তাঁর সখ হয়েছে মেয়ে-জামাই নিয়ে ঘর না করলে আর তাঁর দিন কাটছে না।···

দপ্ করে মুখের হাসি মিলিয়ে যায় হরিচরণের। গম্ভীর হয়ে তিনি বলেন, জামাই যে হবে, সে ত' আজকাল কোমর বেঁধে তোমারই বস্তিতে ফিনাইল আর ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে বেড়ায়! তোমার বস্তির ফাঁদে পড়ে গেছে হে—

—তা হলেও ত বাঁচতুম! না হয় গোটা দুই চাকর রেখে দিতুম তারা ফিনাইল পাউডার ছড়িয়ে বেড়াতো!···কিন্তু আমার গোমস্তা হরিপদ যে অন্য কথা বলে!···

—কি বলে হরিপদ? হরিচরণের মুখে ঔৎসুক্যের উত্তেজনা!

—আমার মুখ থেকে তুমি এ কথা শুনবে? এ আমারই লজ্জা!···মাথা নীচু করে বলেন রায়বাহাদুর—বস্তির একটা মেয়েই নাকি অশোককে দিয়ে এই সব ভূতের ব্যাগার খাটাচ্ছে।

—মেয়ে! হাত থেকে ধপ করে বইখানা পড়ে গেল হরিচরণের!

—হ্যাঁ। এক আধ-পাগলা পণ্ডিত ছিল ওখানে আমার ভাড়াটে···তারই মেয়ে! মেয়েটা নাকি খুব চটকদার কথা বলে!

—হুঁ। তাহলে এর পেছনে আসলে এই ব্যাপার!···রীতিমত গম্ভীর হয়ে পড়েন হরিচরণ।

ইতিমধ্যে শোভা এসে ঘরে ঢোকে। এবং রায়বাহাদুরকে দেখেই বলে, এই যে মেসোমশাই···কি ভাগ্যি যে পুরণো বন্ধুকে মনে পড়লো !···

—সে কি মা ? হাসির রেখা টেনে এনে বলেন রায়বাহাদুর !—আমি এলুম কন্যেদায় গলায় বেঁধে···তোমাদের পাঁচজনের চেষ্টায় এখন ডলি অশোকের হাত দুখানা মেলাতে পারলেই বাঁচি !

রায়বাহাদুরের কথায় শোভা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, কাল অনেক রাত পর্যন্ত আমি আর বাবা অশোকের সঙ্গে অনেক বিতণ্ডা করেছি মেসোমশাই কিন্তু আমার ভাইটিকে জানেন ত ? আমরাই তর্কে হার মেনে চুপ করে গেলুম। আর বাবার কথা···লবকুশের কাছে হার মেনেও ত রামচন্দ্রের আনন্দ !···

রায়বাহাদুর কিছু বলেন না। হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়েন।

হরিচরণ বলেন, কি জানো ভায়া বড় লোকদের ধরে দুটো সস্তা গালাগাল দিতে পারলে এযুগে তার খুব কাটতি···মেয়েটা বোধ হয় সেই বাজি খেলতে বসেছে···আর সেই ফাঁদে পা দিয়েছে তোমার ঐ ভাবী জামাতা বাবাজী।—

রায়বাহাদুর মুখ তোলেন না। মুখ নীচু করে কি যেন ভাবতে থাকেন আপন মনে। শোভা বোঝে ওঁর মনের অবস্থাটা। তাই বলে, আপনি বিশ্বাস হারাবেন না···বাবার শিক্ষায় অশোক মানুষ হয়ে উঠেছে···কোনদিন সে ছোট হবে না···ছোট কাজে কোনদিন সে নামবে না।—

—সে বিশ্বাস আমারও আছে মা !···যাই হোক ভায়া আজ আমি উঠলুম···তোমার আমার বহুদিনের ইচ্ছে ডলির সঙ্গে অশোকের কাজটা হয়ে যায়···হয়ে গেলে আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।···আচ্ছা আজ তবে আসি···

উঠে পড়েন রায়বাহাদুর।

পায়ের তলার মাটিটা কাঁপছে। বরাবর পায়ের নীচে শাসন করে আসা গেল যাদের তারা আজ বুকের মধ্যে কাঁপন ধরায়।

অনেক দিনের ঘুমিয়ে থাকা বাসুকী ফণা ধরে মাথা তুলছে।
পৃথিবীটা কাঁপতে কাঁপতে চৌচির না হয়ে যায়!

সেদিনই অশোককে পেয়ে গেলেন হরিচরণ তাঁর পড়ার ঘরে। অশোক বসে বসে তার ডাক্তারী বইগুলো নাড়াচাড়া করছিল। হরিচরণকে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো।

হরিচরণ কাজের কথাই বলতে এসেছিলেন। তাই একেবারেই কাজের কথা পাড়লেন। বললেন, এ আবার তুমি কি গণ্ডগোল পাকিয়ে তুললে অশোক!

অশোক জানতো এই বস্তির ব্যাপার নিয়ে একদিন না একদিন তার বাবার সঙ্গে আলোচনা ও কথা কাটাকাটি হবেই। কাল রাত্রেই যে সব আলোচনা হয়েছে তাতেই খানিকটা ইঙ্গিত রয়ে গেছে, খোলাখুলি ভাবে কথাটা এগোয় নি এইমাত্র!

তাই হরিচরণের এই অস্পষ্ট প্রশ্নের অর্থ আন্দাজ করতে একটুও দেরী হল না অশোকের। তবু নিতান্ত সহজ ভাবে প্রশ্ন করলে, কি বাবা?

—ওই যে শশধর কি সব বলছিল···তুমি যেন কোথায় নিজের হাতে ফিনাইল ছড়াতে যাও···এ কি কথা?

—ও সেই কথা। ছেলেমানুষের মত হেসে নেয় অশোক বিষয়টা হালকা করে ফেলবার জন্যে।—আপনার বন্ধু যদি তাঁর বস্তিটি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন তাহলে আর আমাদের ব্যাগার খাটতে হয় না বাবা।

হেসে বললেও, কথাটা ঠিক একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। হরিচরণ বাধা দিতে পারেন না। অন্য দিকে চেয়ে বলেন, তা তুমি ঠিক বলেছো···এ ত খুব সহজ কাজ! তার নিজের নোংরা নিজেই সাফ করুক

না কেন! আচ্ছা আমি বলে দেবো শশধরকে…। তুমি যায় সেখানে নাই বা গেলে!

—আমি ডাক্তার! বস্তিতে যদি ডাক পড়ে আমি কি যাবো না আপনি বলতে চান? অশোক খুব নরম অথচ দৃঢ় স্বরে প্রশ্ন করে বসে সোজাসুজি।

প্রশ্ন এ নয়, উত্তরের নামান্তর মাত্র। হরিচরণ একরকম বাধ্য হয়েই মাথা নাড়েন। বলেন, হ্যাঁ তাও ত বটে না গেলেই বা চলবে কেন? তবে কি জানো নোংরা জায়গা নোংরা লোক…মানে তুমি বড় একজন ডাক্তার—তোমার মান সম্ভ্রম…

অশোক হঠাৎ ডাকে, বাবা!

হরিচরণ বাবু মুখ তুলে তাকান অশোকের মুখের দিকে। অশোক কি বলতে চায় তার মুখের আলোতেই বুঝি ধরা পড়বে।

অশোক বলতে থাকে, গরীব বেচারাদের বস্তিতে ঢুকে যদি একটু আধটু উপকার করা যায়…তাতে কি মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়?

—না মোটেই না। ইতস্তত না করেই বলে ফেলেন হরিচরণ। ছেলেকে একেবারে চটিয়ে দিয়ে লাভ নেই। এখুনি হয়ত যুক্তি দিয়ে বক্তৃতা দিয়ে একেবারে কোণঠাসা করে দেবে তাঁকে। নতুন হাওয়া বইছে আজকাল। সে হাওয়ায় পুরণো জীর্ণ দেহ সব শিরশির করে ওঠে।…তাই হরিচরণ বলেন, না মোটেই না—এ ত ঠিক কথা…আমি শশধরকে বুঝিয়ে বলবো…তার সঙ্গে যদি দেখা হয়—। একশোবার ঠিক কথা!…

—উনি বস্তির মালিক…বস্তির ভাড়া নিয়মিত পেলেই খুসী, বস্তির চেহারা একটু ভালো হোক এ গরজ ওঁর নেই…। অশোক আপনমনে তন্ময় হয়েই যেন বলে চলে। সমস্ত পারিপার্শ্বিকের উজ্জল পরিবেশকে অতিক্রম করে সে বস্তির অন্ধকার গর্তের ছবি দেখছে যেন!…

হরিচরণ একটু ব্যস্ত হয়ে বলেন, না না তা আছে…গরজ ওর খুব আছে—।

ও যে বললে লোক রেখে ফিনাইল ছড়াবার ব্যবস্থা করে দেবে।…তবে সবার আগে শশধর ডলির বিয়েটা সেরে ফেলতে চায়…আমি ওকে খানিকটা কথাও দিলুম…। আমি শশধরকে সব কথাই বলে পাঠাবো।…আরে এই যে শোভা এসো মা এসো…ভালই হল তুমি এসে পড়লে…ভাইয়ের সঙ্গে বোঝা পড়া করে ফেলো…।

শোভা এদিকে আসছে দেখে অশোককে শোভার সামনে ঠেকিয়ে দিয়ে হরিচরণ বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

প্রথমটা এক চোট হেসে নিল শোভা আপন মনে। অশোক কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, শোভার এই হঠাৎ হাসিতে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

শোভা বললে, হ্যাঁরে আড়াল থেকে মেসোমশায়ের কথা কিছু শুনেছিলি? বলতে গিয়ে শোভা হাসে।

অশোক ঘাড় নাড়ে সম্মতির দিকে। সঙ্কোচ করে না একটুও।

—কি বল দেখি?

—কি আবার? হাসতে হাসতে বলে অশোক। কাক উড়ে এসে আমার কান দুটো টেনে নিয়ে গেল…আর তোমরা দৌড়চ্ছ কাকের পিছনে।

বটে! শোভা কৃত্রিম রাগের ভঙ্গীতে বলতে থাকে—সত্যি বল্ ত, বস্তিতে একটি মেয়ে আছে কি না?

অদ্ভুত প্রশ্ন। বস্তিতে মেয়ে থাকবে সে আর নতুন কথা কি। গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে আছে ওখানে। তবু অশোকের একটি মেয়ের কথাই মনে পড়ে যায়। অনেক তারায় ভরা আকাশে একটি চাঁদের মত উজ্জল। তবু অশোক

উপহাস করতে ছাড়ে না। সোজাসুজি উত্তর এখানে দেওয়া চলে না। বলে, পৃথিবীর কোন বস্তিতে মেয়ে নেই ?

অশোক প্রশ্নটা ঘোরাতে চেষ্টা করলে কি হবে, শোভা সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসলো। চাপা হাসির সঙ্গে বললে, হ্যাঁ রে তুই তার ফাঁদে পড়িস নি ত ?

অশোক কথায় হারবার নয়। বলে, মেয়েরা ফাঁদ পাতে একথা তোমরাই বল দিদি আমরা বলি না···

—যাক্ শোন বলি···বাবা আর মেসোমশাই দুজনেই তাড়া করছেন··· ওঁরা একটা দিন ঠিক করুন···তোর মত আছে ত? শোভা শুধু হাসির ছলেই বলছে না এবার, ওর স্বরে খানিকটা গাম্ভীর্যের আভাষ !

অশোক কিন্তু তবু হাসে। বলে, পাত্র পাত্রী কেউ পালাচ্ছে না মতও কারো বদলায়নি···শাঁখ টোপর ধুতি শাড়ী সবই পাওয়া যাবে ব্ল্যাকমার্কেটে। দুদিন দেরী করলেও পাঁজীতে আরো অনেক তারিখ আছে···

শোভা এবার হাসে। না হেসে পারে না অশোকের কথা শুনে। বলে, তোর সঙ্গে কিছুতেই কথায় পেরে উঠবো না।···

রায়বাহাদুরের বাড়ীর উপরতলায় বৈঠক বসেছে রোজের মত। আজকের আসরটা ঘরোয়া। তাই উপস্থিত লোকের সংখ্যা অল্প। কেবলমাত্র নিখিল ডলি আর হেমনলিনী।

নিখিল সবেমাত্র এসেছে। এসে প্রথম নজরেই হেমনলিনীকে বলে উঠলো, আজ আপনাকে খুব সুস্থ দেখাচ্ছে···মানে খুব bright মিসেস চৌড্রি !

হেমনলিনী কিন্তু মোটেই প্রসন্ন হন না কথাটা শুনে। ব্যারিষ্টারের কাছ থেকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সার্টিফিকেট পাওয়ার কোন মূল্য নেই তাঁর কাছে। বলেন, তুমি ত বাবা ডাক্তার নও, তোমার কথায় ভরসা পাই নে।

নিখিল মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেখে ডলি হঠাৎ মুখের ওপরই প্রশ্ন করে বসে, আমাকে দেখাচ্ছে কেমন নিখিলবাবু?

ও কোণের কোচের গর্ভ থেকে শরীরটাকে তির্যকভাবে বাঁকিয়ে এক বিচিত্র ভঙ্গীতে লক্ষ্য করছে ডলি নিখিলকে! প্রশ্নের খোঁচাটা শুধু ওর মুখে নয়, ওর ভঙ্গীর মধ্যেও।

নিখিল ডলিকে ভাল করে দেখতে কেমন একটু লজ্জা পায়। তবু জোর করে বলে, Oh, God, মায়ের সামনে আমাকে লজ্জায় ফেলতে চাও তুমি—

ডলি হো হো করে হেসে ওঠে। তার নিজের দেহভঙ্গী সম্বন্ধে নিজেই সে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছে! নিখিলকে লজ্জা দেবার জন্যেই বোধ হয় ডলি বেশী করে হাসে।

এমনি সময়েই অশোক এসে ঢোকে দরজা দিয়ে। অশোকের সাজগোজ ফিটফাট! সেজেগুজে আসর জমাতেই এসেছে সে আজকে।

নিখিল ওকে প্রথম receive করে। সকল সময়েই ওর সপ্রতিভ ভাবটা লক্ষ্য করবার মত! এগিয়ে গিয়ে নিখিল বলে, এসো ডাক্তার—good evening!

হেমনলিনী কোচের মধ্যে নেচে ওঠেন আনন্দের আতিশয্যে। বলেন, এই যে অশোক···এসো বাবা তোমার জন্যেই বসে আছি—

অশোক হাসতে হাসতে বলে, আজ কিন্তু এসেছি ঠিক কাঁটায় কাঁটায়—

—আজ তেরো মিনিট দেরী হলে মা কি আর বাঁচতেন? ডলি ওপাশ থেকে বলে ওঠে হাসির ফাঁকে ফাঁকে।

খুব তাড়াতাড়ি কথা বলা অভ্যেস ডলির। তাই হাসির সঙ্গে সঙ্গে ও যখন কথা বলে ঝরণার ফেনিল জলের মত মনে হয় ওকে অশোকের। কী যে ভালো লাগে তখন ওকে দেখতে।

অশোক তাই ডলির দিকে একবার না তাকিয়ে পারে না। অনেক অর্থে ভরা সে দৃষ্টি।

চকিত হলেও নিখিলের দৃষ্টি এড়ায় না অশোকের এই ভাব পরিবর্তন। নিখিল বলে, মানে উল্টো কথাটাও আছে। অশোকের দিক থেকে বলছি··· এক মিনিটও দেরী করতে পারে না অশোক—বলতে বলতে আড়চোখে লক্ষ্য করে নেয় ও ডলিকে, অশোককে।

অশোক বিচলিত হয়। ডলির কি হয় বোঝা যায় না।

অশোক বলে, কী বকছো নিখিল পাগলের মতন···। এগিয়ে যায় ও হেমনলিনীর দিকে। পরীক্ষা করবার জন্যে।

নিখিল বলে, বকছি নে ডাক্তার···a stock of laugh হেসে নিচ্ছি দুদিন বৈ ত নয়। তোমরা যেদিন হাসবে না···আমি সেদিনও হাসবো··· সেদিনও হাসবো—বলতে বলতে নিখিল উঠে দাঁড়ায়···টুপিটা তুলে নেয় স্ট্যাণ্ডটা থেকে।

অশোক বলে, বেশ কাজ বেছে নিয়েছো ত ?

—হ্যাঁ কাজটা মন্দ নয়···লোক হাসাবার কাজ। এতে পুরস্কার নেই··· মজুরিও পোষায় না···শুধু লোকে হাসে। নিজেকে সঙ্ সাজিয়ে লোক হাসানোও ভাল কিন্তু মিছিমিছি তাদের কাঁদিয়ে কোন লাভ নেই ডাক্তার!

নিখিল চলে যায় ঘর থেকে। অদ্ভুত আজ তার কথা বলার ধরণ। অদ্ভুত চলে যাবার ভঙ্গী। কেউ একটা কথা পর্যন্ত বলে না। নিখিলের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে এক মিনিটের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে অশোক।···ডলি তার কিউটেক্স মাখানো পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা ম্যাটিংয়ের নক্সার ওপর দিয়ে বুলোতে থাকে।

মুষলধারায় বৃষ্টি হতে হতে হঠাৎ থেমে গেলে কেমন যেন থমকে পড়ে আকাশটা!

হেমনলিনী স্তব্ধতা ভঙ্গ করেন। বলেন, বাবা অশোক···তোমার মনের কথা না পেলে আমার পায়ের ব্যথা কিছুতেই সারবে না।

ডলির হাসির অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যায়। সেই সঙ্গে সঙ্গে কথা।—দেখেছো, মা তোমাকে বিশ্বাস করেন না!

ফেনিল ঝর্ণাজলের দিকে তাকায় অশোক। হাসিতে উজ্জল হয়ে ওঠে তার মুখখানা। বলে, এ যুগের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় যে অবিশ্বাসের কাজ করে…মায়ের দোষ কি?

অশোক আবার হেঁট হয়ে পরীক্ষা করতে থাকে হেমনলিনীকে।

ডলি বলে, তুমি কোন যুগের?

—আমি? চিনতে পারা কঠিন।

—তাহলে এটা তোমার ছদ্মবেশ বলো।

অশোকের মনে হয় একবার মুখ তুলে ডলির মুখখানা দেখে, আবার কি মনে করে মুখ তোলে না। হেঁট হয়েই জবাব দেয় ডলির কথায়। বলে, ছদ্মবেশটা খুলে ফেলেছি…তাই তোমরা চিনতে পারছো না…এমনও ত' হতে পারে!

—পুরুষের পোষাকটা বড় তাড়াতাড়ি বদলায়! ডলি না থেমেই জবাব দেয়। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ম্যাটিং ঘষার একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

অশোক ইচ্ছে করেই এ কথার জবাব দেয় না। বরং হেমনলিনীর দিকে চেয়ে আগ্রহের সঙ্গে বলে, বেশ আছেন আপনি…কোন ভাবনা নেই…।

হেমনলিনী সুযোগ ছাড়েন না। বলেন, বাবা, অশোক…আমার যে বড় সাধ তুমি ত জানো সব…তেরো মিনিট দেরী হলে যদি বা বাঁচি তেরো বছর দেরী হলে যে একেবারে অক্কা পেয়ে যাবো বাবা…

বয়েস হলে কি হয় হেমনলিনী বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন এখনও। অশোক ওঁর কথায় শুধু হেসে নেয় খানিকটা কোন জবাব দেয় না। তারপর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে ধীরে ধীরে।

ঘন অন্ধকার রাত্তিরে ঝর্ণার ধারে বসে থাকলে জলশব্দে বুকের ভেতর

কেমন একটা অজানা ভয় থমথম করতে থাকে। ডলির মুখে তেমনি ধরণের একটা থমথমে ছায়া। আহত মুখে বসে থাকে ও চুপ করে।

বরাবর লাইব্রেরী ঘরের সামনে দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে আসছিল অশোক। লাইব্রেরী ঘরে রায়বাহাদুর বসে কি যেন পড়াশুনো করছিলেন। অশোককে দেখে ডাক দেন, তোমাকেই খুঁজছিলুম অশোক!

দাঁড়াতে হয় অশোককে। ইচ্ছে না থাকলেও। ইচ্ছে না থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ অশোকের আন্দাজ করতে দেরী হয় না একটুও যে কী ধরণের কথাবার্তা তাদের মধ্যে হতে পারে। তবু অশোক দাঁড়ায়। বলে, বলুন!

রায়বাহাদুর কাজের লোক। হরিচরণের সঙ্গে ভনিতা করলেও অশোকের সঙ্গে কোনরকম ভনিতা না করেই সোজাসুজি বলে বসেন, নানা লোকে নানা কথা বলে, তুমি আর ঐ বস্তিটায় যেয়ো না বাবা—!

অশোক না হেসে পারে না। সহাস্যে বলে, আমাকে নাবালক মনে করেছেন আপনারা! এটা ভুলে যান যে আমি ডাক্তার ডাক পড়লে যে কোন জায়গায় যেতে হবে।

দরজার পর্দার আড়ালে বাইরে থেকে আর একটা ছায়া নড়ে ওঠে। সে ডলি। ওরা কেউ লক্ষ্য করে না ডলিকে। অন্যায় হলেও, কৌতুহল দমন করতে না পেরে ডলি উঠে এসে দাঁড়িয়েছে।

রায়বাহাদুর বলেন, কিন্তু ওখানে তুমি আনাগোনা করলে কত লোক কত কথা রটায়—মানে এ বাড়ীতে তোমার যাতায়াত আছে কিনা—

—এ বাড়ীতে যাতায়াত থাকলে যে বস্তিতে গিয়ে কোন কাজ করা যায় না…এ আমি জানতুম না। দৃঢ় অথচ সাবলীলভাবেই বলে চলে অশোক।

ডলির ছায়াটা নেপথ্যে আবার দুলে ওঠে। ডলি দাঁড়ায় না আর ওখানে। সরে যায় অন্য দিকে।

—রাগ কোঁর না অশোক। একটু স্নেহভরে বলেন রায়বাহাদুর—রাগ কোর না তুমি। ডলির কানে এ সব কথা উঠলে সে দুঃখ পাবে।···

—ডলির দুঃখ বাঁচিয়ে চলতে গেলে আমাকে অনেক কাজ বাদ দিয়ে চলতে হয়!···আপনারা সবাই মিলে আমাকে আগলে না রাখলেই আমি খুশী থাকবো···

ধৈর্যের সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে রায়বাহাদুরের! দেহ মন উষ্ণ হয়ে ওঠে। গলার স্বরেও সে ঝাঁঝ ফুটে ওঠে। একটু গলা চড়িয়েই বলেন তিনি—কিন্তু তুমি ডলির সমাজের যোগ্য হবে এও ত' আশা করি—

এই মুহূর্তেও অশোক হাসে। বহু দুঃখ আর মৃত্যুর শূন্যতার মাঝে সে হাসির উৎস খুঁজে পেয়েছে। তাই এই অনুচ্চারিত হাসি বড় সহজ। একটুখানি হাসির রেশ বজায় রেখেই অশোক বলে, ডলির সমাজের কিসে যোগ্য হওয়া যায় আমি জানি নে, জানবার চেষ্টাও করি নে···সময়ও কম!··· আচ্ছা আসি···নমস্কার!···

রায়বাহাদুর ঠক ঠক করে কাঁপেন। রাগে নয় দুর্বলতায়ও বটে!

সমস্ত পৃথিবীটা বুঝি সূর্যের কক্ষচ্যুত হয়ে যাচ্ছে!

অশোক বেরিয়ে আসে বাড়ী থেকে। সামনে মখমলের মত চকচকে নরম লন। অদূরে টেনিস কোর্ট! আশেপাশে ফুলের স্তবক! অশোক দেখছে না কিছুই। বস্তির অন্ধকার কী ভীষণ। আর সেখানকার সেই বিষাক্ত হাওয়া—মানুষের নোংরা গা আর নোংরা কাপড়জামার ভ্যাপসা গন্ধ আর নর্দমার পচা জল···অশোকের দম আটকে আসছে!···

ওদিকে একটা ক্রিসেন্থিমামের ঝোপ। এই লালচে ক্রিসেন্থিমাম ডলির খুব প্রিয়। লালচে ক্রিসেন্থিমাম বড় একটা দেখা দেখা যায় না। ডলির পছন্দ

বলে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করে লাগানো হয়েছে। কতদিন এই ঝোপের ধারে ডলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে। তাই আসতে যেতে ক্রিসেন্থিমামের ঝোপের দিকে নজরটা তার আপনার থেকেই পড়ে। তার মাঝে ডলিকে ত সে দেখে না...। দেখে সেই ঝর্ণার ফেনিল জল আর তার ধারে ধারে ছোট ছোট লাল ক্রিস্নেন্থিমামের চুমকি—

ডলি আজ নেই সেখানে। অশোক এগিয়ে আসে। ড্রাইভটা ঘুরলেই গ্যেটের মুখে এসে পড়বে।...ড্রাইভের বাঁকেই ডলি দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে এগিয়ে আসে সোজাসুজি। অন্যদিন ক্রিসেন্থিমামের ঝোপ ঠেলে ডলি আসতো। ফুলের ডালগুলো তুলতো কিছুক্ষণ। আর আজ নেহাৎ ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে অশোকের। ডলি তাড়াতাড়িই এগিয়ে আসছে। তার শান্তিনিকেতনী চটিটার ফাঁক দিয়ে কিউটেক্স লাগানো বুড়ো আঙ্গুলটায় কখন যে হঠাৎ এক ফালি সূর্যের আলো এসে পড়ে চকচক করে উঠলো অশোকের দৃষ্টি আলগোছে তার ওপরই গিয়ে পড়ে।...সবই নতুন লাগছে আজ।

ডলি বলে, কি যেন বড় বড় কথা হচ্ছিল তোমাদের?

—ওঃ মস্ত মস্ত কথা। অশোক হাসে।—আমি আজকাল খুব মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠেছি জানো ডলি?...

—খুব জানি। পণ্ডিত বলেই ত' এত ঝগড়াটে। এত ঝগড়া শিখলে কোত্থেকে? ছেলেমানুষের মত আবদারে স্বরে বলে ডলি।

—আমার নামে এত গুজব—আর ঝগড়া কোত্থেকে শিখলুম শোন নি? ইচ্ছে করেই খোঁচা দিয়ে বলে অশোক।

—তুমি আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছ অশোক।...ঝর্ণা নয়, খুব শীতল শান্ত হ্রদের মত ডলির স্বর!

—সম্ভব! মানুষ বদলায় তার পথও বদলায়।

—তোমার এ কথার মানে কি অশোক? ডলি একটু ব্যাকুল, একটু উষ্ণ!

—বুঝতে চাইলে মানে খুব সোজা!

অশোক যেন আজ শুধু ঝগড়া করবেই!

—কিন্তু তোমার বস্তিতে যাওয়া আমারও পছন্দ নয়! 'আমারও' কথাটার ওপর ডলি তার সমস্ত অন্তর দিয়ে চাপ দেয়।

—তোমাকে পছন্দ করতেই হবে, এমন কথা বলি নি!

—তার মানে তুমি আমার কথা শুনবে না!

—বাবার কথাও শুনি নি।

অল্প হাওয়া লেগে ক্রিসেন্থিমাম অল্প অল্প দুলছে। অশোক সেইদিকে চেয়েই বলে।

—তবু আমার কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি···তোমার বস্তিতে যাওয়া··· সেখানে মেয়েছেলের সঙ্গে মেলামেশা আমার একেবারেই মত নেই!

সম্পূর্ণভাবে চেয়ে আছে ডলি অশোকের চোখের দিকে।

ক্রিসেন্থিমামের এত আলো আছে কি যে অতদুর থেকে অশোকের চোখে পড়বে?

—আর কিছু বলবে?

—আর তুমি আমার মান খোয়াবে···এ আমি সইবো না!

ডলি মুখ তুলে দেখলো অশোক নেই। গেটের দিকে এগিয়ে গেছে।

দমকা হাওয়ায় ভেজানো দরজা হঠাৎ খুলেই আবার দুম্ করে বন্ধ হয়ে যায়। সেটা হাওয়ার গুণেই।

—সাত—

অনু কিছুতেই বুঝবে না। ওর ধারণা অশোকের এই পরিকল্পনা কার্যকরী হবার নয়!

অশোক বোঝাচ্ছে অনুকে। এক গাদা কাগজপত্র বের করে বলে, এই দেখো আমাদের কাজের মোটামুটি খসড়া…আর দরখাস্তের কপিগুলো সব দেখো। দরখাস্তগুলো সব কর্পোরেশনে পাঠিয়ে দিয়েছি।

—এসব কাজের বিপদ কি জানেন? বিজ্ঞের মত প্রশ্ন করে অনু।

—বিপদ কিসের?

—এদের লোভ আপনি বাড়িয়ে তুলছেন…এরপর এদের ক্ষিধে মেটাতে পারবেন?

—তাই বলে এই নোংরামির মধ্যে চুপচাপ তোমরা সবাই বসে থাকতে চাও কেমন? অনেককাল মুখ বুজে পাঁকে পড়ে আছো, এবার একটু চেষ্টা করেই দেখো না। কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বলে অশোক!

বাইরে থেকে লোকের কোলাহল শোনা যায়।

—গোলমাল কিসের? প্রশ্ন করে অশোক।

—আপনার ওষুধের দোকানে ভীড় লেগেছে মালপত্র এসে গেছে বোধ হয়।

—তাই নাকি? এসো দেখি ত একবার!

ওরা দুজনে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

কিছু কিছু জিনিসপত্র এসে গেছে এর মধ্যেই বড় বড় ফিনাইলের টিন। ব্লিচিং পাউডারের প্যাকেট।

একটি লোক অনভ্যস্ত হাতে ফিনাইলের টিন নিয়ে উপুড় করে দেয় এক জায়গায়। উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে ফিনাইল গড়িয়ে যায় খানিকটা। সামান্য একটু গলে, বাকিটা তেলের মত গড়ায়।

অশোক চেঁচিয়ে ওঠে। আরে না না না অমন করে ফিনাইল দেয়?

—আজ্ঞে বাবু···থতমত খেয়ে যায় লোকটা!

অশোক এগিয়ে এসে টিনটা তুলে ধরে। বলে, আগে জলে খানিকটা ঢেলে গুলে নিয়ে তারপর ছিটিয়ে দিতে হয়···। আরে আরে তুমি আবার পাউডার নষ্ট করছো কেন এমন করে? জানো আজকাল ব্লিচিং পাউডার পাওয়া যায় না?···

একটা লোক মুঠো মুঠো করে ছড়াচ্ছিল সে-ও দাঁড়িয়ে পড়ে বোকার মত।

অশোক এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে পাউডারগুলো কেড়ে নিয়ে নিজে ছড়িয়ে দেখিয়ে দেয়। ছড়াতে ছড়াতে বলে, তোমাকে একবার দেখিয়ে দিয়েছি না···মনে থাকে না কেন?

—আজ্ঞে ডাক্তারবাবু সাত জন্মে চোখেও দেখি নি···মনে থাকবে কেমন করে।

অনু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কোন কথা বলে নি। লোকটার বলার ধরণ দেখে বলে, দেখো খেয়ে ফেলো না যেন!

সকলে হেসে ওঠে চারিদিক থেকে।

এমন সুস্থ হাসি হাসে নি অনেকদিন ওরা।

অশোক হাসে। হো হো করে হেসে ওঠে ধমক দিয়ে।

ক্রিসেন্থিমামের মত লালচে সে হাসি!

ওদিকে দুটি নীচু স্তরের স্ত্রীলোক কি যেন বলাবলি করে! একজন বলে, আ মর্ বলছি যে ওগুলো পাউডার···

আর একজন বলে, একটু মেখে গ্যাখ না কেন লা!

—দাঁড়া দেখি।

এদিক ওদিক তাকিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসে ও তারপর এক খাবলা পাউডার তুলে নিয়ে গা ঢাকা দেয়।

কেউ লক্ষ্য করে না ওকে। করবার ফুরসৎ নেই কারও। সকলে তখন এক অজানা আনন্দে মেতে উঠেছে।

ঐ শাদা পাউডার শাদা ফিনাইল গোলা জলের মত শাদা হয়ে আসছে যত কিছু কালো !......

অশোক ওদিকে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি জুড়ে দিয়েছে।

কে একজন নর্দমা মাড়িয়ে ঘরে ঢুকছিল। তাকে দেখে চীৎকার করে ওঠে অশোক—বলি ওহে কর্তা নর্দমা মাড়িয়ে ঘরে ঢুকছো যে···পা ধোও !···

—এই যে ধুই। লোকটা বাধ্য হয়েই দাঁড়ায়। অনিচ্ছা থাকলেও অশোকের হুকুম অমান্য করতে সাহস করে না কেউ আজকাল ! লোকটা এগিয়ে আসে অশোকের দিকে। বলে, আচ্ছা ডাক্তার বাবু চারটি খড় আমাকে দিতে পারেন ঘরের চালটা ছেয়ে নেবো···

—খড় দেবো চাল দেবো···কাপড় দেবো···ওষুধ দেবো···সবই চাও বুঝি ? কাজ করতে পার না ? অশোক রীতিমত ধমকে ওঠে। মানুষগুলো তার হাতের মুঠোর মধ্যে···এমনি মনে হয় আজকাল !

—আজ্ঞে কাজ করলে ত সবাই পায়···না করে পেলেই ত লাভ !

লোকটা নেহাৎ বেয়াড়া। অনু হাসতে থাকে ওর কথা শুনে। আড়-চোখে অশোকের দিকে তাকায়। হাসিটা অশোককে উপলক্ষ্য করেই।

অশোক বোঝে কেন অনু হাসছে। আজকাল অনু এত সহজ হয়ে এসেছে ওর কাছে। রেগে ওঠে ও ভয়ানক রকম। চীৎকার করে বলে, বটে, আমি এসে তোমাদের নোংরা ঘাঁটবো আর তোমরা চুপ করে বসে থাকবে ?··· কাজ করলে বকশিস পাবে বুঝলে ?

লোকটা আর জবাব দেয় না। ঘাড় নেড়ে চলে যায় আপনার ঘরের দিকে।

আর একটা লোক চট্ করে এগিয়ে আসে কোত্থেকে। চুপি চুপি বলে ডাক্তারবাবু ও বেটা নাপতে ভারি চালাক…পয়সা কড়ি ওর হাতে যেন দেবেন না…মেরে দিয়ে চম্পট দেবে…

—তাই নাকি ? অন্যমনস্ক হয়ে বলে অশোক।

—তার চেয়ে আমাকে দিন দুটো টাকা…দেখবেন আপনার এই বস্তিকে একেবারে ঠাকুর ঘর বানিয়ে ছেড়ে দেবো—

লোকটা যেন বিগলিত হয়ে ওঠে। নিজের কথায় নিজেই যেন উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

অশোক বলে, বেশ দেবো আগে নর্দমটায় বুরুশ লাগাও দেখি ?

—যে আঁজ্ঞে।

বুরুশ ঘাড়ে করে দৌড়য় লোকটা। কিছু একটা সে যেন করে বসবেই, আর একটা লোক ছুটে আসে অন্য দিক থেকে।—দেখলেন ত ডাক্তারবাবু দেখলেন—আমি বলেছিলুম…ওই যে হলধর চমপটি ওকে বিশ্বাস করবেন না…আপনার ওষুধের দোকান থেকে এক শিশি কুইনাইন নিয়ে স্রেফ চম্পট…

অশোক যেন হকচকিয়ে যায়। এর থেকে নিখিল রায়কে tackle করা সহজ! রেগে মেগে বলে, আমরা কতদিক সামলাবো…তোমরা চোখ রাখতে পারো না ?…

লোকটা আপনার ঝোঁকেই বলে চলে, ওকে ধরলে কি আর স্বীকার পাবে ? ও ভারি ধূর্ত বেচে মেরে দিয়েছে—

অনু ওদের চেনে। তাই মোটেই বিব্রত হয় না ওর কথায়। বরং উল্টে ওকেই চাপ দেয়। বলে, তুমিও যে সেদিন দুটো নতুন ঝুড়ি নিয়ে গেলে… কি করলে ?

অম্বুর দেহ ঘিরে এক অপূর্ব দৃপ্ত ভঙ্গী !

লোকটা এবার থতমত খেয়ে যায়।··· আঁজ্ঞে আমি চুরি ত করি নি··· শুধু না বলে নিয়ে গেছি। চাইবার আগেই আবার ফিরিয়ে এনে দেবো।

ব'তে বলতে পিছু হটতে থাকে লোকটা। তারপর কখন নিঃশেষে মিলিয়ে যায় ভীড়ের মাঝখানে।

অশোক হাসে হো হো করে।

একমাত্র হাসি দিয়েই জয় করতে হবে এদেরকে।

তবু মৃত্যুর মধ্যস্থ্যতায় ওদের সঙ্গে সম্পর্ক।

অশোক চেয়ে দেখে অম্বু অবাক হয়ে তার হাসির দিকে চেয়ে আছে।

বস্তির মাঝখানে ক্রিসেন্থিমাম ফোটানো যায় না কি ?

হরিচরণবাবুর শেষ চেষ্টা চলেছে। যে করে হোক অশোককে ফেরাতেই হবে। তা না হলে সমাজে তাঁর মান থাকে না। তাঁরই ছেলে অশোক। তাঁরই শিক্ষায় তাঁরই নিজের বাড়ীর আবহাওয়ার মধ্যে তাঁরই সমাজে কেন্দ্রীভূত হয়ে সে মানুষ—সে অশোকই আজ নেমে যেতে বসেছে। ভাবতে গিয়ে অস্থির হয়ে ওঠেন হরিচরণ। ভাবাও যায় না ঠিকমত। কেবল একটা বেদনাদায়ক অনুভূতি মনটাকে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে যেন।

শোভাই একমাত্র অবলম্বন হরিচরণের। অশোকের মা নেই। মা থাকলে হয়ত অশোক এমনটা হয়ে যেতো না।···নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হয় হরিচরণের।···শোভার ওপর ভরসা করেই চেষ্টা করতে হবে তাঁকে।···

সকলেই আছে ঘরের মধ্যে। হরিচরণ আছেন, শোভা আছে, অশোকও আছে।···আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে ওদের সম্বন্ধটা। পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখে মনে মনে। খুব উঁচু পর্দায় ঝঙ্কার দিয়ে

বেজে উঠেছিল তারের যন্ত্রটা—তারই মাঝে হঠাৎ কোন একটা তার ছিঁড়ে গেছে। এত সূক্ষ্ম সে তার যাকে চট করে ধরা যাচ্ছে না ঝঙ্কারের মধ্যে··· কিন্তু অনুভূতিটা আছে।···

ঐ একই সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। আজকাল ঐ বস্তির ব্যাপারটাই তাদের আলোচনার একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছে।···

হরিচরণ একটু গম্ভীর ভাবেই বলছেন,—আমি খোঁজ নিয়ে দেখলুম···ও সব ছোটলোকের জায়গা তুমি ওখানে গেলে তোমার মান থাকবে কেন?··· লোকে আমাকে নানা কথা বলছে—

অশোক আজ আর হাসে না। হাসবার সময় নেই আর। বলে, একদিন আপনিও ত' ডাক্তার ছিলেন বাবা।

—হ্যাঁ তা ছিলুম! তবে ওসব নোংরা জায়গায় কখনও যাই নি।— অতীতের আভিজাত্য-গর্বে হরিচরণের মুখ কেমন স্ফীত হয়ে ওঠে—তুমি বিলেত ফেরত ডাক্তার তোমার কত নাম···কত বড় বড় লোক আসে তোমার এখানে···তুমি যাবে কেন ওখানে অশোক!

হরিচরণের আভিজাত্য যেন আর্তনাদ করে উঠছে অলক্ষ্যে।

বর্তমান রূপ নিচ্ছে। উচ্ছ্বসিত বন্যার মত প্রগলভ সে রূপ।

অশোক অনমনীয় কণ্ঠে বলে, কিন্তু এ দেশটা গরীবের আপনি ত জানেন। এত নোংরায় ওরা পড়ে থাকে দেখলে লজ্জা করে। যদি ওদের জন্যে কিছু করা যায়—

শোভা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। অশোক উত্তেজিত হয়ে উঠছে দেখে একটু স্নেহভরে বলে, তুই কেন যাবি ভাই ওদের মধ্যে···অন্য ডাক্তারও ত' আছে।

—সকলের চোখে সব জিনিষ পড়ে না দিদি! তোমাদের টাকা আছে, সুবিধে আছে তোমরা বেশ ভালো করে বাঁচতে জানো···কিন্তু ওরা না বাঁচলে আমরা দাঁড়াবো কোথায় বলতে পারো?

হরিচরণ চমকে ওঠেন! এ যেন অশোক নয়, অন্য কেউ কথা বলছে তাঁকে ঠকিয়ে।

হরিচরণ চীৎকার করে ওঠেন—এ আমি দেখছি তোমরা সবাই মিলে একটা হৈ চৈ বাধিয়ে তুললে! তুমি বস্তিতে ঢুকে নিজের হাতে ঝাঁটা আর বালতি নেবে…আর ঐ ছোটলোকের দল তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে— হরিচরণ শেষ করতে সময় নেন …।…

অশোক বলে, বাবা আপনি ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না!

হরিচরণ মনে মনে উষ্ণ হয়ে উঠলেও মুখে অনেকটা সহজ ভাব দেখাতে চেষ্টা করেন। মাথা নীচু করে বলেন, কেমন করে বুঝবো বলো বিলেত ফেরৎ বড় ডাক্তার…ফিনাইলের বোতল নিয়ে বস্তিতে ঘুরে বেড়ায়…এটা বুঝতে আমার দেরী হবে কেন বলো ?…

কথাটা কতদূর গড়াতো বলা যায় না। হঠাৎ ডলি আর রুনু এসে ঢুকলো ঘরে। হাওয়াটা বদলে যায় হঠাৎ!

—এসো মা এসো। হরিচরণ আদর করে ডাকেন ওদেরকে।

শোভা একটু অবাক হয়েছে, বলে, হঠাৎ যে ? পথ ভুলে ?

—হঠাৎ নয় দিদি। ডলি তার স্বাভাবিক চাপল্যের সঙ্গে বলতে থাকে। —মেসোমশাইকে একটা খবর দিতে এলুম।

—কি মা ? ব্যস্ত হয়ে ওঠেন হরিচরণ!

—একটি জিনিষ আবিষ্কার করেছি। আপনারা সবাই ভীষণ রাগী লোক।

—এই কথাটি বলতে এতদূর ছুটে এলে ? শোভা অপ্রস্তুতের মত বলে বসে। ঠাট্টা করেই বলে হয়ত! সকলেই হেসে ওঠে ওর কথায়।

হঠাৎ অশোক মুখ ফিরিয়ে বলে, ছুটে আসা খুব সহজ দিদি…বড়লোকের মেয়ে নিজের মোটর, ব্ল্যাকমার্কেটের পেট্রোল—

অশোক এমনভাবে কথাগুলো বলে যে মনে হয় তার কথা সবাই শুনুক

এইটাই সে চায়। ওর কথার মধ্যে বিদ্রূপ থাকলেও এই ব্যাকুলতাটুকুও যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

সকলেই আবার হেসে ওঠে।

হাসতে হাসতেই খানিকটা গাম্ভীর্যের ভান করে ডলি বলে, মেসোমশাই আমি বলি ওঁকে আপনারা কেউ কিচ্ছু বলবেন না। ওঁর সখ হয়েছে বস্তি উদ্ধারের—উনি করুন! বেশ লাগে নতুন কাজ ত' বটে—

ঝর্ণার জলে আবার স্রোত লেগেছে। ফেনীল জল ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে।

অশোক শুধু শোনে না, চেয়ে চেয়ে দেখেও।

রুণু এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। ডলি যেভাবে অশোককে কথা শোনাচ্ছে আর অশোক না বাধা দিয়ে শুনছে রুণু তাতে আরও কিছু বলার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

রুণু বলে, এই ধরুন লোকে সখ করে চিড়িয়াখানায় যায়—

—হ্যাঁ রুণু ঠিক বলেছে। আমোদ পেলেই ত হল! এমনভাবে সায় দেয় ডলি রুণুর কথায় যে মনে হয় যাই বলুক রুণুর কথায় যে কোন ভাবেই সায় সে আজকে দেবেই।

হাসির হট্টগোলের মধ্যেও সকলেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে।

হরিচরণ সবার মাঝে হঠাৎ উঠে পড়েন। তাঁর উপস্থিতির আর প্রয়োজন নেই। যাবার সময় শোভাকে ডেকে বলেন, এদের একটু চা দাও মা।

হরিচরণের পিছন পিছন শোভাও বেরিয়ে যায়। যাবার আগে বলে, তোমরা বসো ভাই…এই চিড়িয়াখানা থেকে যেন পালিয়ো না আবার।

একলা পড়ে গেছে অশোক। আগে আগে হলে সেটা মোটেই নতুন ঠেকতো না, বিচিত্রও লাগতো না। কিন্তু আজকাল সব বদলাচ্ছে। অতি নিকট অতি পরিচিত মানুষগুলোর মধ্যেও কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।

বনে বনে যখন বসন্ত জাগে তখন সে কি নতুন জাগরণ আর শিহরণের পালা···। তারপর সেই বসন্তই পুরাণো হয়ে আসে।

গাছে গাছে আঝোরে ফুল ঝরায়! যে গাছে ফুল জেগেছিল!···রুণু বলে, দয়া করে এবার একটু মুখ ফেরান মশাই!—

অশোক হাসিমুখেই ওদের দিকে চেয়ে দেখে। হয়ত বলতেও চায় কিছু। কিন্তু ডলি অদ্ভুতভাবে কথা বলছে আজ। তাড়াতাড়ি ও বলে ওঠে, না রুণু ওঁকে একটু গম্ভীর থাকতে দাও···উনি ত' আর তোমাদের মতন ছেলেমানুষ নন···উনি বড় ডাক্তার···বিলেত ফেরৎ···

নিতান্ত ছেলেমানুষের মতই কিন্তু আবোলতাবোল কথা বলছে ডলি। বর্ষাস্নাত আকাশটার মত দেখায় ডলিকে। যেখানে যেখানে মেঘ ঘুচেছে সেখানে সেখানে নির্মল নীলের হাতছানি!

অশোক হঠাৎ বলে বসে, কথাবার্তাগুলো মন্দ নয়! তবে কে কার জন্যে ঘটকালি করছে বুঝতে পারছি নে—

ঝর্ণার স্রোতমুখে একটুকরো পাথর। পাথরকে ঘিরে ঝর্ণার জল আরও চঞ্চল আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

—হয়েছে! এবার দয়া করে একটু মুখ খুলে হাসো···সকলের গোমড়া মুখ দেখে দম আটকে এলো···বাবারে বাবা···বস্তি বস্তি বস্তি! পৃথিবীতে যত বস্তি আছে সব ঠিকানা তোমাকে এনে দেবো—

ডলির কথা শুনে অশোক আর রুণু হেসে ওঠে।

ডলি থামে নি তখনও। অশোকের হাসি দেখে আরও জোর গলায় বলে, মানুষ পরোপকার করতে গিয়ে যে এত চেঁচামিচি করে, এ আমি জানতুম না।

—তুই একটা ঢাকঢোল নে ডলি অশোকবাবুর পিছু পিছু বাজাবি—রুণু যে কাকে ঠাট্টা করছে বোঝা যায় না।

—তার চেয়ে নিজের ঢাক নিজেই পেটাবো মন্দ কি? অশোক ডলির দিকে চেয়ে রুণুর কথায় জবাব দেয়!

—হ্যাঁ সেই ভাল···মানাবেও! বাপরে বাপ···তোমার হাত থেকে ছাড়া পেলে বস্তির লোকেরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

বর্ষার আকাশ বেশী নীল দেখাচ্ছে।···

দোল লেগেছে ক্রিসেন্থিমামের ডালে।···

সকলের উচ্চহাসিতে ঘরটা গমগম করে ওঠে!

—আট—

নতুন একটা সূর্যের আমদানী হয়েছে। তার আলো পৌঁছয় খাদের গভীর অন্ধকারেও।

অন্ধকারে যারা ছিল, আলো পেয়ে তারা ডানা ঝাপটায়। চোখ ধাঁধিয়ে পরস্পর পরস্পরকে খোঁচা দেয়। ঝগড়া করে মরে। আবার উল্লাসে নৃত্য করে ওঠে। সূর্য আলো দেয়!

রমানাথের সঙ্গে কার যেন ঝগড়া বেঁধেছে।

রমানাথ রেগে উঠে বলে, একটা লোকের মাথায় পাঁচজনে মিলে কাঁঠাল ভাঙচিস কেমন?

—যা যা—লোকটা মুখ ভেঙ্গিয়ে উড়িয়ে দেয় রমানাথকে—ভারি তোর মুরোদ—খালি ফিনাইলের বোতলগুলো নিয়ে তুই না বাজারে বেচে এলি?

—এবার আমার নামে দোষ না? দোষটা অস্বীকার করতে না পেরে রমানাথ অন্য পথ নেয়। বলে, ওই যে বোতল বেচে এক পাঁট ইয়ে কিনে আনলুম···তুই ভাগ বসালি নে?···

—আমি কাজ দেখিয়েছি ডাক্তারকে বুঝলি···তোর মত নয়! লোকটা না হাসলেও রেগে মেগেই দাঁত বার করে। ছোপ ধরা কালো কালো দাঁত!

—কাজ ত খুব···আগে লুকিয়ে কোকেন বেচতিস···আর এখন কুইনাইন বেচে আসিস লুকিয়ে—

—অমন করলে আমিও কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবো রমানাথ—লোকটি সত্যি সত্যিই রেগে উঠেছে এবার!

—যা যা নাপতের ডিম! রমানাথ জাত তুলে বসে।

অশোক ওদিক থেকে আসছিল। ওকে দেখে লোকটা সরে পড়ে। রমানাথকে বিশ্বাস নেই সব হয়ত ফাঁস করে দেবে, রমানাথ কিন্তু সরে না। হাজার হলেও অন্নুর সঙ্গে ডাক্তারের অত মাখামাখি···ভয় কি তার?

রমানাথ বরং ঝগড়ার কথাটাই ঘুরিয়ে তোলে।—দেখলেন ডাক্তারবাবু বলেছিলুম ও লোকটাকে বিশ্বাস করবেন না! ওই দেখুন···টাকা দিলেন কেরোসিন কিনতে সেই কেটে পড়েছে আর চুলের টিকি দেখা যায় না···

অশোক কি আর করবে, রমানাথের কথা বলার ভঙ্গী দেখে হাসতে থাকে। বলে, আচ্ছা বলতে পারো কাকে বিশ্বাস করবো···আর কাকে করবো না!

রমানাথ একেবারে বিগলিত হয়ে পড়ে। হাত দুটো কচলাতে কচলাতে বলে, স্তর আমি ছাপাখানায় চাকরি করি আমায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন!···

—তুমি নেশা কর?

অশোকের অনুমান মিথ্যে নয়। রমানাথ এক মিনিট ইতস্তত করে। তারপর বলে, আজ্ঞে তা একটু আধটু এমন কিছু নয়—যদি কিছু বাজার থেকে কিনতে হয় টাকা কড়ি আমার কাছেই দেবেন···

হরিপদ ওদিক থেকে এদিকে আসছিল। রমানাথ ওকে আসতে দেখে আর বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। 'নমস্কার' বলে সরে পড়ে। দুজনের সম্বন্ধ যেন সাপ আর নেউল! দেখলেই আস্তিন গোটায়। নেহাৎ অশোকের সামনে বলেই রমানাথ মানে মানে সরে পড়ে। অনেক কষ্টে সবে একটু হাত করে এনেছে ডাক্তারকে এমন সময়ে—। নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গেই সরে পড়তে হয় রমানাথকে।

হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে আসে হরিপদ।

—এই যে ডাক্তারবাবু!

—কী খবর!

—এই শুনছিলুম রমানাথটা আপনাকে কেমন ধাপ্পা দিলে—লোকটা কিন্তু একেবারে শয়তান—

অশোক বিরক্ত হয়ে উঠেছে ওদের এই রকম কথাবার্তায়! বলে,—তাই নাকি? প্রশ্ন করলে কি হবে ওর গলার স্বরে এতটুকুও আগ্রহ নেই!

হরিপদ কিন্তু উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, এই দেখুন না আপনার ব্লিচিং পাউডারের বস্তাটা বেচে এক জোড়া বাঁয়া তবলা কিনে নিয়ে এলো সেদিন··· গৌরীসেনের পয়সা দেখেছে—

হরিপদ হয়ত আরও কিছু বলতো, কিন্তু অনুকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে সরে যায় ওখান থেকে। আর যাই হোক এ মেয়েটার মুখের সামনে দাঁড়ানো যায় না। ও সামনে এসে দাঁড়ালে সব যেন গোলমাল হয়ে যায়। হরিপদ অস্বস্তি বোধ করে।

অনু অশোকের বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে খানিকটা হেসে নেয়। বলে দশচক্রে ভগবান এবার ভূত হবে দেখছি—

অশোকের চিন্তার মেঘ তখনও কাটে নি। ভারী গলায় ও জবাব দেয়, এখানে কাজ করতে গেলে এখানকার লোকদের আগে মানুষ করে তুলতে হবে।···

—এদের কাজে না নামালে এদের অভাব ঘুচবে না···নিজেদের ভালোও যে এরা বোঝে না!

—শোন অনু। অশোক দরকারী কথা বলার জন্যে অনুকে প্রস্তুত করে নেয়।—আমাদের দরখাস্তের জবাব এসেছে···আরো জিনিষপত্র শীগগীরই সব এসে পড়বে···

বলতে বলতে অশোক তার মানিব্যাগটা খুলে এক তাড়া নোট বের করে। বলে, এই টাকাটা ধরো তুমি···রেখে দিও তোমার কাছে এখানকারই কাজে লাগবে।···

অনু যেন চমকে ওঠে। বলে, ক্ষমা করবেন··· আমি সামান্য ঘরে থাকি টাকা রাখার জায়গা আমার নেই। আপনি নিজের কাছেই রাখুন।

অশোক আর কিছু বলতে পারে না। নিজের দুর্বলতা সে মনে মনে মেনে নিয়েছে। যত বড় বিলেত ফেরৎ ডাক্তার সে হোক না কেন, বস্তির এই মেয়েটার মুখের ওপর কথা বলতে কোথায় যেন তার আটকায়।

মেয়েটা বড় বেশী কম কথা বলে, বোধ হয় সেই জন্যেই। স্রোতটা ধীর কিন্তু তলায় তলায় টান আছে।

অশোক টাকাটা ফিরিয়ে নেয়।

অলক্ষ্যে কয়েকটি স্ত্রীলোক ওদের লক্ষ্য করছিল। তারিণীও ছিল ওদের মধ্যে। এটা আজকাল ওদের নিয়মিত কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টাকা দেখে ওরা নানারকম কুৎসিত ইঙ্গিত করে।

—মেয়েটা কি বোকা দেখেছো লা···হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে।

—টাকায় কি হবে? গয়না চায় গয়না! বুঝেছিস!

তারিণী ছড়া কাটে; রাখালী গো রাখালী, কত রঙ্গ দেখালি! টাকা নিলে না হাত পেতে গয়না গাটিই বোধ হয় চায়—

একজন বলে, বেশ ত' তাই নে না কেন? আর কিছু না পারিস কানে এক জোড়া মাকড়িই গড়িয়ে নে···কি বলো ভাই?

ঈর্ষায় হেসে ওঠে সকলে। সে হাসি বড় ভয়ানক।

আর এক কোনে হরিপদ এসে দাঁড়িয়েছে একটি স্ত্রীলোকের গা ঘেঁষে।

মেয়েটি আবদারে ন্যাকা গলায় বলে, কই আমাদের এক জোড়া মাকড়িও জোটে না।···

—মাকড়ি! সামান্য মাকড়ি হ্যাঃ—আয় পাগলি আমার সঙ্গে মাকড়ি ত মাকড়ি তোর কানে আমি তাজমহল ঝুলিয়ে ছেড়ে দেবো·· আয়।

হরিপদ আকর্ষণ করে ওকে।

হেমনলিনীও বুড়ো বয়সে আবদার ধরেছেন

রায়বাহাদুর নিরুপায়।

হেমনলিনী অশোকের হয়ে বলেন—একটা মিথ্যে হৈ চৈ বাধিয়ে তুললে তোমরা! অশোককে আমি জানি সে ছেলে মানুষ···তার দুদিনের খেয়াল! আমি বলি ঠাকুর মশায়কে ডেকে একটা দিন ঠিক করে ফেলো—ডলির সঙ্গে কাজটা আগে হয়ে যাক যত শীগগীর হয়···তারপর অশোকের মন ফেরাতে কতক্ষণ?

তার আগেও অশোককে বোঝাবার চেষ্টা চলে।

কিন্তু অশোকের এক কথা,—আমি যে ডাক্তার বাবা!

হেমনলিনী বলেন, দেরী করলে আর আমি বাঁচবো না বাবা।

অশোক আহত হয় যেন। বলে, ওঃ সেই একই কথা!

শোভা বোঝে খানিকটা অশোকের কাজকে শুধু নয়, অশোককেও। বলে, তোর যা ভাল লাগে তুই যাতে আনন্দ পাস সে কাজ তোকে ছাড়তে বলতে পারি নে···কিন্তু···শোভা ইতস্ততঃ করে—

অশোকের মুখে বিষণ্ণ হাসি। পাতলা মেঘে জ্যোৎস্না অস্পষ্ট হয়ে আসছে। অশোক বলে,···হ্যাঁ কিন্তু···কিন্তু একটা আছে বৈ কি! বলে ফেলো দিদি···

—কিন্তু কিছু নয় ভাই। তুই যা করছিস তাই করে যা···তোর যা ভাল লাগে তাতেই আমার আনন্দ। তবে আমার কি মনে হয় জানিস? কিছুদিনের জন্যে ঘুরে আয় বাইরে থেকে···

—আমাকে ভোলাচ্ছ দিদি?

—না রে!

তবে কি ভুল হয়ে গেছে অশোকেরই?

ভুল বোঝার ভুল?

ডলি আর অশোক।

যেমন ভালো লাগছে তেমন আবার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে অশোকের।

ক্রিসেন্থিমাম বড় বেশী লাল।

ঝর্ণার জলস্রোত বড় বেশী প্রবল হয়ে উঠেছে!...

ডলি আজ নতুন স্বরে কথা বলছে। নতুন করে সেই পুরণো সুর! সেদিন রুনু ছিল সঙ্গে। আজ রুনু নেই। তারপরে ত' ডলির সঙ্গে এই দেখা।

ডলির আজকের উপস্থিতিটা সেই কথাটাই শুধু জানিয়ে দেয় আজ আর রুনু নেই সঙ্গে।

ডলি বলে, তোমার কাজে বাধা দেবো না...আমাদের বাধা কেনই বা তুমি মানবে?

—আসল কথাটা বলে ফেলো ডলি কি তুমি বলতে চাও!...

—সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠেছে!...আমাকে তুমি এমন শাস্তি দিচ্ছ কেন?...আমি কি করেছি তোমার?

ওর গায়ে জড়ানো মিহি-কোমল ক্রেপ শাড়ীটার মত নরম পাতলা আর কোমল দেখাচ্ছে ডলিকে। ওকে ভেদ করে অন্তরটা দেখা যায় যেন।

ঝর্ণার জল সমতল মাটিতে এসে নামছে!

ডলি কি আজ কাঁদবে?

—কি আর করবে! কিছু না! মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে অশোক!

—মানুষ কাজও করে...বিশ্রামও নেয়...দিদি যা বলছেন তুমি কিছুদিনের জন্যে ঘুরেও ত' আসতে পারো!

ডলি বড় বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে!

—হ্যাঁ পারি! কোথায় যাবো বলো? সমুদ্রের ধারে? মন্দ কি? বেশ- চলো! রাজি আছি...। ছোট ছেলেকে বেড়িয়ে আনলেও তার আবদার সেরে যায়...তাই চলো...সমুদ্রের ধারে...

—তুমি ফিরে এসে আবার কাজ করতে পারবে।

শান্তভাবে তাকাচ্ছে ডলি ওর দিকে ।

—মানে বস্তির কাজ? থাক্…ও কাজ না করলেও চলবে…তা ছাড়া এত লোকের অনুরোধ ও আমি ছেড়েই দেবো··সেই ভালো…চলো, সমুদ্রের ধারেই যাওয়া যাক্…

অশোক এক হাতের আঙ্গুলের মাঝে মাঝে অন্য হাতের আঙ্গুলগুলো ঢুকিয়ে চাপ দেয় জোর করে। চাপ পেয়ে আঙ্গুলের মাথাগুলো রক্ত-লাল হয়ে ওঠে।

ঐ রক্ত নিয়েই ত যত গণ্ডগোল। ঐ রক্তেই নাচানাচি!

অশোক রক্ত-মুখর ডগাগুলো দেখে।

—একি তুমি সত্যি বলেছো? বিশ্বাস করতে পারে না ডলি!

—ভয় পাচ্ছো কেন ডলি? বস্তির কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। অশোক জোর দিয়ে দিয়ে হাসে। হাসতে হাসতে ডলির নগ্ন বাহুতে আলগোছে চাপড় দেয় একটা। ডলির দেহ ত' নয়, নরম আগুন! অশোক বলে চলে, বস্তির কাজ ছেড়েই দিচ্ছি! চোর ছ্যাঁচড়…ছোট লোক…নোংরা…ওসব যেমন আছে থাক্…আমার কি! তার চেয়ে চলো বেড়িয়ে আসি সমুদ্রের ধারে…

বালুতটের মতই নিজেকে বিছিয়ে দিচ্ছে অশোক তরঙ্গ ক্ষুব্ধ ডলির চার পাশে।

অশোক আর ডলি!

—নয়—

সমুদ্রের ধারে ধারে ছড়িয়ে পড়েছে ওরা। দলটা নেহাৎ ছোট নয়। অশোক, ডলি, রুণু, নিখিল, মিলি আর সুশোভন।

নীল সমুদ্রের তীরে তীরে নীল স্বপ্নের মন নিয়ে বসে আছে ওরা। স্নান করবার জন্যে কস্‌টিউম পরে নিয়েছে সকলে। দেহের সকল বাঁকে বাঁকে চাপ জামা এঁটে গেছে।

প্রচণ্ড তরঙ্গে ফেনীল হয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে আছড়ে আছড়ে পড়ছে সমুদ্র। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের ভীষণতা বাড়ছে। মনে মনে ভয় করছে অনেকের। বিশেষ করে সমুদ্রস্নানে অভ্যাস নাই যাদের!

নিখিল এগোতে গেছলো ঢেউয়ের সঙ্গে। তারপর তলিয়ে গিয়ে আছাড় খেয়ে খুব নাস্তানাবুদ হচ্ছে দেখে রুণু খিল খিল করে হেসে ওঠে ওদিক থেকে। রুণুর সমুদ্রস্নানে খুব অভ্যেস আছে তাই তার হাসিটা অশোভন নয়।

ডলি বেশীদূর এগোয় না। অল্প দূর থেকেই সাবধানে ঢেউ কাটাতে থাকে। অশোক তীরে বসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

মিলি বলে, বসে আছেন যে? ঢেউ দেখে ভয় পেলেন বুঝি?

অশোক একটু হেসে জবাব দেয়, তোমরা খুব সাহসী!

মিলি জলে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল। হঠাৎ এক ঢেউয়ের ধাক্কায় উল্টে পড়ে। মিলি চীৎকার করে ওঠে। ওদিকে নিখিল আছাড় খেয়ে পড়ে রুণুর ঘাড়ের ওপর।

হুটোপাটি চলে।

উন্মুক্ত আকাশ আর উন্মত্ত জল,—তার মাঝে এদের উন্মুক্ত ও উন্মত্ত স্নান চলে।

অশোক ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল জলের মধ্য দিয়ে।

ডলি বেশ এগিয়ে গেছে এমন সময় ডলি উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে, না, না, অতদূরে যেয়ো না—

—বা রে চান করবো না!

ছোট ঢেউয়ের স্তরটা পার হয়ে বড় ঢেউয়ের স্তরে পৌঁছে গেছে অশোক ততক্ষণ।

ডলির মনে হয় অশোককে দেখে সমুদ্র বেশী করে উত্তাল হয়ে উঠেছে!

—ঢেউ যদি ভাসিয়ে নিয়ে যায়?

—যদি নিয়ে যায় ফেরাতে পারবে না! ঢেউয়ের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে অশোকের দম ফুরিয়ে আসছে, তবু সে হাসে।

—না…না…শোনো…অত দূরে যেয়ো না…ভয় করে…

ডলি নিজেই এগোতে থাকে অশোকের পেছনে।

একলা ত ছাড়া যায় না অশোককে।

এমনি ভাবেই আকাশ-সমুদ্রের মিলন-লীলার দূর-পটভূমিকায় ওদের স্নান-যাত্রা চলে।

শুক্লপক্ষের ঘন জ্যোৎস্নায় সাগরের বিশাল বেলাভূমি মোহমধুর সৌন্দর্যে ভরা। কিছু অস্পষ্টতা…কিছু বা স্বপ্নের মায়ালোক…

ওরা সমুদ্র, সমুদ্রের হাওয়া, জ্যোৎস্না ও পরস্পরকে একই সঙ্গে উপভোগ করবার জন্যে জড় হয়েছে। এক জায়গায় বসলেও ওরই মধ্যে একটু একটু

ছাড়া ছাড়া হয়ে বসেছে ওরা ইচ্ছে মত। মিলি-সুশোভন, নিখিল-রুণু, অশোক-ডলি!

মিলি বলে, এতদিন পরে ডলির মুখে হাসি ফুটেছে।

সুশোভন জবাব দেয়, ওদের বিয়েতে দামী উপহার দিতে হবে।

নিখিল বলছে, এ আমি বিশ্বাস করিনে মিস সেন্!

রুণু অবাক হয়। কিংবা অবাক হবার ভান করে মাত্র। বলে, কেন?

—অশোক এক কথায় বস্তির সেই মেয়েটাকে ছেড়ে এলো, একদিন ডলিকেও সে অকূলে ভাসাবে না একথা বিশ্বাস করো?…

—আপনি বড্ড লোকের নিন্দে করেন মিষ্টার রায়। চলুন…ডলির গান শুনি গে!…

ডলি গান গাইছিল ওপাশ থেকে। বোধ হয় অশোককে শোনাবার জন্যেই। হাওয়ায় উড়ে আসে সে গান। ভেসে চলে ওদের সকলকে অতিক্রম করে।

পর্বতগামী মেঘ টুকরো হয়ে আকাশে ওড়ে!

গান থামলে পরে নিখিল গলাটা বাড়িয়ে শুধোয়—গান কেমন লাগলো ডাক্তার?

অশোক যেন সচকিত হয়ে ওঠে। বলে, গান? হ্যাঁ বেশ লাগছে!… ও! গান থেমে গেছে নাকি? বেশ ত গাইছিলে…গাও!

ডলি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বলে, গান কি তুমি শুনছিলে না?

—না।

—কেন? কোনদিকে মন ছিল?

—আমার ভালো লাগে না।

—ও, এভাবে আমাকে অপমান না করলেই পারতে!

পর্বত অনেক দূরে।

মেঘ ফিরে আসে।

জলপূর্ণ মেঘ!

বোতল গড়াচ্ছে। শূন্য ফিনাইলের বোতল। সাপ্লাই বন্ধ। বস্তিতে আবার আবর্জনার স্তূপ। যে বুরুশগুলো আবর্জনা পরিষ্কার করবার জন্যে এসেছিল সেগুলো আবর্জনার সঙ্গে এক হয়ে জমে আছে রাস্তার ধারে। নর্দমা আবার নোংরায় ভরে উঠেছে। চারদিকে আবার দুর্গন্ধ। ব্লিচিং পাউডার নেই।···আবার সেই বীভৎস দৃশ্য।

নতুন সূর্যটা কি অস্ত গেল?

দাতব্য চিকিৎসালয়ের দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার সামনে পথের ওপর রোগীরা ধুঁকছে!

একটি মেয়ে বলে, বাবা ওষুধ কি আর দেবে না?

বাবা বলে, না মা, দোকান বন্ধ. বড়লোকের খেয়াল মিটে গেছে মা··· চল্···চল্ মা···চল্······

আর একজন বলে, গরীবের কপালে সুখ সইলো না······

অপর জন বলে, দুদিন ওষুধ পথ্যি জুটেছিল···তাই আমাদের লাভ রে ভাই······

অন্নুর অবস্থা অবর্ণনীয়। চারদিক থেকে বিদ্রূপ আর খোঁটা দিয়ে সকলে মিলে ওকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

তারিণী বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলে, কেমন? বলেছিলুম না তখন! যেমন

বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়েছিলি…এবার গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়ে গেছে ত ?

আর একটি স্ত্রীলোক রসান দেয়। গালে হাত রেখে ভঙ্গিমা করে বলে, তা যা বলেছ ভাই…জাতও গেল পেটও ভরলো না…সখ মিটিয়ে পাখী যে উড়ে পালাবে সবাই জানতো……

তারিণী চাপ দেয় অনুকে বাগে পেয়ে,—বল্? জবাব দে ?…বেড়া বেঁধে কি বেনো জল ধরে রাখতে পারলি ?…

—আমি তাঁকে ধরে রাখতে চাইনি বৌদি! অতিষ্ঠ হয়ে অনু শেষে জবাব দেয় ভাঙ্গা গলায়। মনটা তার পাক খেয়ে ওঠে।

—বাঁধতে জানলে বেনো জলকেও বাঁধা যায়…। গলার মধ্যে কৃত্রিম সহানুভূতির মিশেল এনে বলে তারিণী—তোর খ্যামোতা কোথায় ? এখন সরে পড়েছে কি না, তাই উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমো। কেমন ? ওঃ তখন মেজাজ… যেন সেপাইয়ের ঘোড়া !…যত পারে শুনিয়ে দেয় তারিণী, ছাড়ে না।

অপর স্ত্রীলোকটি বলে, থাক ভাই থাক কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিস নে, আয়—চলে আয়……

কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েই আনন্দ পায় ওরা।

অনু কিছু বলে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেখানে ছিল।

রমানাথ এদিকে আসছিল। স্ত্রীলোকটি সরে যায় রমানাথকে আসতে দেখে। রমানাথও অনুকে শোনায়। অবশ্য ওর বলার ভঙ্গীটা অন্যরকম, এই যা। বলে, ওরা বড়লোক,—বুঝলি…চোখের চামড়া নেই ওদের…তুই আবার ওদের বিশ্বাস করতে গিয়েছিলি—!

অনু দাদার ওপর খুব রাগ করে না। তবু দাদাই সময়ে সময়ে ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে আজকাল। অনু শান্তস্বরে বলে, তিনি ত' নিজেই কাজ করতে এসেছিলেন দাদা…আমি বলি নি……

—এবার ঠেলা সামলায় কে? দুটো লোক মাইনের জন্যে হাঁটাহাঁটি করছে···আমি পাবো কোত্থেকে শুনি?

রমানাথের কালকের রাত্তিরের নেশায় চোখ দুটো অল্প অল্প লাল হয়ে ওঠে!

তারিণী মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে।—তোমার গলাতেই গামছা দিয়ে আদায় করবে! এবার বোনের জন্যে জেল খাটো!

—না না বৌদি···সে কথা বোল না···দাদার কোনো দোষ নেই!···

অনু দাদার জন্যে সত্যি সত্যিই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গে পড়বে ও!

রমনাথ চুপ করে যায়। কিন্তু তারিণী চুপ করে না। বলে, দোষ নেই বললে ত' আর পাওনাদারে ছাড়বে না···তার চেয়ে যা না কেন···সেই ডাক্তারকে খুঁজে নিয়ে আয়···দশ বিশ টাকা আদায় কর···পারিস নে? মরণ দশা!······

বলতে বলতে দুম দুম করে পা ফেলে গা দুলিয়ে দুলিয়ে চলে যায় তারিণী!

রমানাথ বলে, তোর কপাল···তোর কপালই মন্দ রে হতভাগি!—

চওড়া কপালের মত সমুদ্রতীরের বালুতট।

ব্যর্থতার ঢেউ আছড়ে আছড়ে ভেঙ্গে পড়ছে!

বহু তরঙ্গের মাঝে এক ফালি খবর।

কোলকাতায় নাকি মহামারী সুরু হয়েছে বসন্তের?

সমুদ্রতীরের বাংলো সরগরম হয়ে ওঠে।

রুণু প্রথম কাগজটা হাতে পেয়েছিল। সে-ই ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয়,—ডলি, কোলকাতার খবর শুনেছিস? বসন্তের মহামারী লেগেছে সেখানে—

—কোলকাতায় বছরে দুটা মহামারী লেগেই থাকে! নতুন কি? ডলি উদাসীনভাবে জবাব দেয়।

সিগারেটের শেষ চিহ্নটুকু এ্যাস-ট্রের মধ্যে মুছে দিয়ে নিখিল বলে, After all we are safe!

সুশোভন বলে, বস্তিগুলোতেই বেশী মড়ক লেগেছে।

—আগে ওরাই মার খায়! হাতের চুড়িগুলো পরপর সাজাতে সাজাতে মিলি বলে।

অশোক এতক্ষণ রুণুর হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে পড়ছিল, হঠাৎ কাগজটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

কি ব্যাপার! সকলে উৎসুক হয়ে চেয়ে দেখে অশোকের দিকে। ওর দৃষ্টি কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

—আমাকে যেতে হবে।

এমনভাবে বলে ও কথাগুলো যেন সত্যিই তার ডাক এসেছে।

—কোথায়? ডলি প্রশ্ন করে।

—কোলকাতায়।

—কোলকাতায়! মহামারীর মাঝখানে! ডলি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ এখবর আমাকে স্থির থাকতে দেবে না।

অশোক যেন আরও বেশী অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে।

রুণু বলে, কিন্তু আপনার নিজের বিপদ?

আত্মীয়তার প্রশ্ন হলেও অশোকের কাছে মূর্খ বলে মনে হয়।

অশোক বলে, ওটা আমার ভাবনা—

—কিন্তু তোমার যাওয়াটা এমন কিছু urgent নয় ডাক্তার—ঠাস্ করে দেশলাইটা জেলে নিখিল আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে।

—That I will consider Nikhil···

ডলি কথার মোড় ঘোরায়। বলে, এত তাড়াতাড়ি যেতে চাও, তার চেয়ে না এলেই পারতে!

—এখন সেই কথাই ভাবছি।

—এলে কেন? তোমার পায়ে ধরে আমি ত সাধতে যাই নি?···তুমি যে কেন সেইখানে যেতে চাও সেকথা বেশ ভাল করেই জানি—

এলোমেলো কথা বলতে সুরু করেছে ডলি।

—কি বলছো তুমি?

অশোক একটু তীক্ষ্ণ গলাতেই বলে।

বাগানে ক্রিসেন্থিমামই একমাত্র ফুল নয়।

—থাক্, তোমার চমকে ওঠায় আমি আর ভুলবো না···আমি জানি বেশ জানি···তবুও বলে দিচ্ছি তুমি সেখানে যাবে আমার একটুও মত নেই!

অশোক বসেই থাকে।

ডলি হন-হন করে বেরিয়ে যায় ওখান থেকে।

অনু জায়গা ছেড়ে এতটুকু নড়ে না। ঠায় চুপ করে বসে থাকে মিণ্টুর মাথার কাছে। মিণ্টুর মাথায় হাত বুলোয়। বাতাস করে। জ্বর দেখে। মিণ্টুর বসন্ত হয়েছে। শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে কদিন ধরে। তার পাশে ডাক্তারের দেওয়া খেলনা গুলো।

মিণ্টু আস্তে আস্তে ডাকে, দিদি,—

—কি রে মিণ্টু? স্নেহভরে বলে অনু।

—দিদি, ডাক্তারবাবু কোথায়?···কখন আসবে ডাক্তারবাবু?···

বাইরের পথে মোটরের হর্ণ শোনা যায়। সহরের রাজপথে গাড়ী চলাচলের বিচিত্র শব্দ কোলাহল সব ভেসে আসে।

ওরা উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

—দিদি দিদি···ওই যে···ওই যে ডাক্তারবাবুর গাড়ী···

গাড়ীর শব্দ মিলিয়ে যায়। হাসির রেখা মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

আগে এমন দিন ছিল ঐ পথ বেয়ে অনেক কিছু আসতো আর এখন সব কিছুই চলে যাচ্ছে ঐ পথ দিয়েই। কিছুই দাঁড়ায় না।

বস্তির চারদিকে রোগের কাতরানি···মৃত্যুর পদশব্দ···আর্তনাদ···কান্না।···

বল হরি হরিবোল—

বস্তির দক্ষিণ কোন থেকে এইমাত্র একটা মড়া বেরিয়ে গেল।

আগে আগে হরিধ্বনি শুনলে বুক কাঁপতো। আজকাল সহজ হয়ে এসেছে—মৃত্যু সহজ হয়ে এসেছে। ছোট ছেলেরা ভ্যাংচায়। তাড়া করে পেছন পেছন খানিকটা।

সামনে প্রাচীর পত্রের জ্বলজ্বলে লেখাটা এখনও দেখা যাচ্ছে।—বসন্তের মহামারী অবিলম্বে টিকা লউন—। আশ্চর্য, বহু দিনের লেখা ওটা কিন্তু এতটুকুও ম্লান হয় নি।

এতটুকুও কাজ হচ্ছে না লেখাটা দিয়ে। ডাক্তার নেই। ডাক্তারখানা বন্ধ! লোকে মাথা চাপড়ায়।

তারিণী বাইরে থেকে মিণ্টুকে দেখে। ঘরে ঢোকে না। অন্য স্ত্রীলোকদের বলার নাম করে অন্যকে শোনায়—ছেলেটাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিল···এত মড়ক লেগেছে এইবার পথে ছেড়ে দিয়ে আয় না কেন?···কি বলো ভাই।

কেউ বলে, হ্যাঁ তা ত বটেই বনের বেড়াল বনেই থাক্···

—আমরা ভাই থাকবো না এখানে। বিজ্ঞের মত বলে তারিণী—উনি বেরিয়েছেন বাসা খুঁজতে। আমরা ত' আর মরতে পারি নে···

মিণ্টু যন্ত্রণায় ছটফট করে আর বলে, দিদি···ডাক্তারবাবু কখন আসবে··· ডাক্তারবাবু এলে আমার অসুখ সারবে দিদি—

—চুপ কর মিণ্টু। অনু অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

— দিদি, তুমি কেন ডেকে আনছো না ডাক্তার বাবুকে···দিদি আমি নিশ্বেস নিতে পারছি নে···ডাক্তারবাবু···ডাক্তারবাবু···তুমি ডেকে আনো দিদি···মিণ্টুর স্বর এলোমেলো হয়ে আসছে···

—মিণ্টু মিণ্টু।···

অনু ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

অনু সোজা হরিচরণবাবুর বাড়ীতে এসে প্রবেশ করে। এসেই প্রথমে শোভাকে দেখতে পেলো ও। শোভাকে প্রথম দেখলেও চিনতে কষ্ট হল না অনুর। অশোকের মুখে তার দিদির কথা সে অনেক শুনেছে।

অনু একেবারেই প্রশ্ন করে বসে, ডাক্তারবাবু কোথায়?

—কে তুমি? কোত্থেকে এসেছো? চিন্তিত মুখে বলে শোভা।

বস্তির ওখান থেকে এসেছি···ডাক্তারবাবু কি নেই? অনু তখনও হাঁপাচ্ছে। কথাগুলো বলছে অতি কষ্টে।

— কি দরকার? শোভার স্বর কঠিন হয়ে আসছে।

—আমার ভাই মিণ্টুর বড় অসুখ—

— কিন্তু অশোক আর তোমাদের ওখানে যাবে না···। শোভা দু পা এগিয়ে যায়।

— যাবেন না? মিণ্টুর জন্যেও না?—অনুর বিস্ময় বাড়ছে ক্রমশঃ।

—তুমি ভাই অন্য ডাক্তার নিয়ে যাও।—

অন্য ডাক্তারের টাকা লাগে···অশোকবাবু আমাদের কাছে টাকা নেন না তাই এসেছিলুম···যদি দয়া করে যেতেন···

—তোমাদের ওখানে যেতে অশোককে আমরা মানা করেছি···বস্তিতে আনাগোনা করে অশোকের নামে অনেক কথা রটেছে—শোভা ধীরে ধীরে বলতে থাকে কথাগুলো। বোধ হয় অনিচ্ছার সঙ্গেই।

—ও, তা জানতুম না। অনু ব্যথিত স্বরে বলে।

—তাছাড়া, তোমার এ বাড়ীতে ছুটে আসাও ভালো হয় নি।

—আমার ভাই হয়ত বাঁচবে না তাই এসেছিলুম। আপনার ভাই হলে আপনি ও কি ছুটে বেরোতেন না ?···যদি আর কেউ না থাকতো ?···

ঝোঁকের মাথায় বলে চলে অনু। চোখে মুখে তার অদ্ভুত চঞ্চলতা।

—কিন্তু সে ছেলেটা শুনেছি তোমার নিজের ভাই নয় ?

—তাকে পথ থেকে পেয়েছি···মানুষ করেছি···আমারই ভাই সে··· আচ্ছা···আমি যাই···

অনু যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অমনি অশোকের গাড়ীর হর্ণ বেজে ওঠে বাইরে থেকে। চমকে ওঠে ওরা সকলে।

এতদিনের শোনা হর্ণ ভুল হবার নয়।

অনু উজ্জ্বল মুখে বলে ওঠে, ডাক্তারবাবু আসছেন !—

অনুর অনুমানই সত্যি ! অশোকের গাড়ীই বটে। গাড়ীর মধ্যে অশোক, ডলি আর রুনু।

অনুকে দেখে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়।

অশোক অনুকে দেখে এগিয়ে যায় ওর দিকে। বলে, কি হয়েছে ?

—মিণ্টু বোধ হয় বাঁচবে না ডাক্তারবাবু !

—সে কি ? তাকে রেখে এলে কার কাছে ? অশোকের স্বরে অদ্ভুত এক ব্যাকুলতা !

সকলে নির্বাক হয়ে যায়। অশোকের একি বিসদৃশ আচরণ! সবাইকে ছেড়ে একটা বস্তির মেয়েকে নিয়ে—

অনু কোন দিকে তাকায় না। অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে চলে, ডাক্তারবাবু আপনি আমাদের সবাইকে···বস্তির সমস্ত লোককে ঠকিয়ে··· অপমান করে চলে এসেছেন···মনে করেছিলুম আর কোন দিন আপনার সঙ্গে আমার যেন দেখা না হয়···কিন্তু—

—কি বলছো তুমি এ সব? শোভা পিছন থেকে প্রশ্ন করে।

অনু শোভার কথা শোনে কি না বলা যায় না। অশোকের দিকে চেয়ে আগের মতই বলতে থাকে, কিন্তু মিণ্টুর জন্যে আর থাকতে পারলুম না···এত লোকের সামনে অপমানের ভয় মনে রেখেও লজ্জা সরম ভুলে ছুটে এসেছি···

কি অসম্ভব করুণ দেখাচ্ছে অনুর ছিপছিপে লম্বা দেহখানা! পাতা ঝরা বিসর্পিল শীর্ণ ডালের মত!

ডলি এগোয় এবার। আগে থেকেই উত্তপ্ত হয়ে আছে সে। অনুকে এই প্রথম দেখলো সে। এবং দেখেই দ্বিগুণভাবে জ্বলে উঠলো। বললে অশোক যাবে না···যেতে পারবে না···

কি সে বলার ভঙ্গী ডলির। বিশেষ করে অশোক কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করলো যে শোভাকে উপেক্ষা করলেও অনু ডলির দিকে একবার না তাকিয়ে পারলো না। কিন্তু মুখে কিছু বললো না। মুখটা তার আরও করুণ হয়ে উঠলো।

রুনুর বরাবরই পিছন থেকে কথা বলার অভ্যাস। রুনু বললে বস্তিতে এখন মহামারী···অশোকবাবুর যাওয়া উচিত হবে না।···

আর চুপ করে সময় নষ্ট করা যায় না। অশোক বাড়ীর ভেতরের দিকে চলে যায়।

অনুরও সময় নেই দাঁড়াবার। ডলি, রুনু আর শোভার মাঝামাঝি

তাকিয়ে সকলকে লক্ষ্য করেই ব'লে, আমার দাঁড়াবার সময় নেই···হয়ত মিণ্টু ডাকছে···। যদি ডাক্তারবাবু না যান বলবার কিছু নেই···আপনাদের বিবেচনার ওপরেই ছেড়ে দিয়ে গেলুম···। তাছাড়া···মিণ্টুর জীবনের দাম আপনাদের কাছে সামান্যই একথা জেনেই আমি এসেছিলুম—

অনু আর কি বলবে খুঁজে পায় না যেন ! শুধু হাঁপাতে থাকে উত্তেজনায়। তারপর চলে যাবার জন্য পিছন ফেরে।

ফিরেই দেখে অশোক দাঁড়িয়ে। ইতি মধ্যেই বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। হাতে তার ডাক্তারী ব্যাগ !

রুনু চমকে উঠে প্রশ্ন করে, কোথা যান অশোক বাবু !

—আমাকে যেতে হবে ওখানে। যেন কিছুই হয় নি, এমনভাবে বলে অশোক।

ডলি যেন আঁতকে ওঠে,—বস্তিতে !···দিদি···মেসোমশাই···আপনারা কি বারণ করবেন না ?···সেখানে যে ভয়ানক বিপদ !···

কি বলবে, কাকে ডাকবে ডলি খুঁজে পায় না যেন। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপে।

হরিচরণ ঘর থেকে সব শুনছিলেন। ডলির ডাক শুনে বেরিয়ে আসেন। কি জানি কি হয়ে যায় মেয়েটার !

অশোক চলে যাচ্ছিল। ডলির চেঁচামিচি শুনে একবার পিছন ফিরে দাঁড়ালো। বললে, ছেলে ভোলাতে চেয়েছিলে···মন্দ লাগে নি সমুদ্রের ধারে··· কিন্তু কাজ ভোলাতে চেয়ো না···ওটা মনুষ্যত্বে বড্ড লাগে···

বনে বনে আগুন লেগেছে।

ক্রিসেন্থিমামের লাল আগুন !

হরিচরণ বলেন, তোমরাই ভুল করেছিলে মা···অশোক আমারও ভুল ভেঙ্গে দিয়ে গেল।···

হাতের লাঠির বাঁটটা খুব জোর মুঠোয় চেপে ধরেন তিনি। তবু লাঠিটা কাঁপছে!

রমানাথ বাসার ঠিক করে এসেছে। বাহাদুরী আছে রমানাথের। তারিণী হঠাৎ আজ রমানাথের কর্মতৎপরতার সুখ্যাতি করতে থাকে। রমানাথের ভালো লাগে না। এ আবার কি আপদ! ন্যাকামী দেখলে গা জ্বলে!...বস্তির রাস্তার মুখে দাঁড়ানো ঠেলা গাড়ীটার ওপর মালপত্র তুলতে থাকে। এই নরককুণ্ড থেকে পালাতে পারলে হয় একবার প্রাণ নিয়ে।

মালপত্রের মধ্যে একটি ভাঙ্গা তোরঙ্গ, একটি বস্তা, ছেঁড়া কাঁথা আর বালিশ, ভাঙ্গা হাড়ি বালতি ঝাঁটা...কাঠ-কাটরা আর গলার দড়ি বাঁধা একটা বেড়াল।

তারিণী আজ সারাদিনই বকে চলেছে। রমানাথকে মালপত্র গোছাতে দেখে বলে, ওগো চল আর দেরা করো না...আমার কাহিল শরীরে যদি ছোঁয়াচ লাগে...তবে আর বাঁচবো না।

নেশার ঘোর না থাকলে শুখনো শুখনো মস্করা ভাল লাগে না রমানাথের মুখের ওপরই বলে দেয়, তোমার শরীর কাহিল...হা ভগবান!

তারিণীর শরীরের মেদবহুল অংশগুলোর দিকে কটাক্ষ করে রমানাথ। কটাক্ষ নয় নির্লজ্জ দৃষ্টি!

তারিণী কথার মোড় ঘোরায়। বলে, গাড়োয়ানটা কোন চুলোয় গেল?

—বোধ হয় খৈনী টিপতে গেছে।

রমানাথ গাড়ীর পিছনটা ধরে ঠেলা দিতে বলে, তুমি সামনের দিক থেকে টানো আর আমি পেছন থেকে ঠেলি...পালাতে পারলে বাঁচি বাবা!...দুর্গা দুর্গা!...

ওধার দিয়ে অশোক এসে দাঁড়ায়। আর একটু তফাতে অনু।

অশোককে দেখে তারিণী ব্যস্ত হয়ে মাথার কাপড়টা টেনে দেয়।

—কোথা চললে রমানাথ। পরমাত্মীয়ের মত বিস্মিত কণ্ঠে অশোক প্রশ্ন করে।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম ডাক্তার সাহেব···হাড় কখানা থাকতে থাকতে সরে পড়ছি।··

তারিণী চাপা গলায় পরামর্শ দেয় রমানাথকে। উদ্দেশ্য অশোকও কথাগুলো যেন শুনতে পায়। বলে, দু'কথা শুনিয়ে দাও না কেন?···বলো যে আপনার আক্কেলটাও দেখে গেলুম—

অশোক আর দাঁড়ায় না, বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার অবসর নেই তার। মিণ্টু তাকে ডাকছে।

রমানাথ শুধোয়, ছেড়ে দিয়ে আবার তেড়ে ধরলো কেন বলো ত?

—তোমার বোন যে পায়ে ধরতে গিয়েছিল—পুরুষ মানুষের মন ত'!

তারিণী রঙ্গে রসে একেবারে যেন গলে পড়ে।

অশোক সোজাসুজি মিণ্টুর ঘরে এসে দাঁড়ায়। অনু মুখ তুলে তাকায় অশোকের দিকে, অশোকও দেখে অনুর দিকে। বর্ষার মেঘের মত কালো আর সজল হয়ে উঠেছে অনুর চোখদুটো।

অশোক পাগলের মত ডাকে, মিণ্টু···মিণ্টু···

মিণ্টুর পৃথিবীটা মুছে গেছে মহাশূন্য থেকে।

সূর্যের ডাকে পৃথিবী সাড়া দেয় না।

অনু হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে···নেই···মিণ্টু নেই ডাক্তারবাবু···

অশোক অপরাধীর মত তাকায় অনুর দিকে। অনুর বোবা অশ্রু যেন কথা বলছে—মিণ্টুকে বাঁচাতে পারলুম না···আমাদের দারিদ্র্য···আমাদের অশিক্ষা নিয়ে সে চলে গেল···কিন্তু, যারা বেঁচে রইলো···যাদের কেউ নেই···

যারা পথে পড়ে মরে·· রোগে ভুগে মরে···তাদের যেন বাঁচিয়ে তুলতে পারি তাদের কাছে থেকে যেন সেবা করতে পারি···তবেই নিজের মনকে সার্থক মনে করবো।···

আর এক মৃত্যুর মরুভূমি পার হয়ে নদী এগিয়ে আসছে সাগরের দিকে।

বিশাল নীল সমুদ্রের চোখে পথক্লিষ্ট নদী ঝলমল করে ওঠে···বড় সুন্দর দেখায়···।

—দশ—

অনেক কিছু বদলেছে। আরও অনেক আলো। আলোয় ঝলমল করছে চারদিক।

খাদের অন্ধকার আলোর তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে।

অনু আরও কাছে সরে এসেছে। অশোক তাকে ভালো করে দেখছে। ভালো করে দেখবার সুযোগ মিলছে আজকাল।

বিরাট হাঁসপাতাল গড়ে তুলেছে অশোক বিগত প্রাণ মিণ্টুর নামে, শুধু দরিদ্রদের সর্বহারাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা সেখানে।

অশোক সেই শ্রেণীর যাদের সব আছে, সবের বেশী আরও অনেক কিছু আছে। আর অনু সেই স্তরের যাদের বাঁচবার অবলম্বনটুকু নেই। এই ছুটি পরস্পর বিমুখ মন এসে জড় হয়েছে একমুখী হয়ে।

শক্তির বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে বহু দিনের পুঞ্জীভূত বেদনার কালো মেঘে!

অনু না হলে অশোকের চলে না। হাঁসপাতাল অনুর অভাবে একরকম অচল।

আর অশোকও ত' হাঁসপাতালকে ছেড়ে নিজেকে কল্পনা করতে পারে না আজকাল! সারা দিনই সে ব্যস্ত। সময় নেই একটুও।

বাড়ীতে সকলে ঠাট্টা করে। শোভা বলে, হ্যাঁরে হাঁসপাতালে তোর কাজ আর ফুরোয় না না রে? ওর কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে কোন বক্র উল্লেখ থাকে কি না অশোক তা ভ্রূক্ষেপও করে না।

সত্যিই আর দাঁড়ায় না অশোক।

অনু নার্স হয়েছে হাঁসপাতালে। একাধারে সে মেট্রন আবার অশোকের সহকারী।

অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারে অনু। অশোক বিস্মিত হয়ে দেখে। অনুর ছিপছিপে লম্বা দেহটা সাবলীলভাবে নড়া চড়া করে, কাজের বন্যায় ফেনীল হয়ে ওঠে।

এ আর এক ফেনীল জলস্রোত।

বড় ভালো লাগছে অশোকের!

অনুর বড় বড় চোখে জল নেমে আসে।

ঐ জলের মধ্যেই ত' মিণ্টু অমর হয়ে আছে। অশোকের অতবড় হাঁসপাতালের সমারোহের মধ্যে সে স্মৃতি কত ম্লান!

অনুকে যতই দেখে কতরকম বিচিত্র ভাবনা সব ঝাঁক বেঁধে আসে অশোকের মনে।

শুধু লাল নয়, চারিদিকে থরে থরে নানা রঙ্গের ফুল ফুটে উঠছে।

বহুক্ষণ ধরে অশোক মুগ্ধ হয়ে দেখে অনুর কাজকর্ম। এটা ওটা নিয়ে আলোচনা করে, তদারক করে। শেষে একসময় উঠে দাঁড়ায়।

অনু বলে, চললেন?

অশোক হাসে। বলে, আর কোন ছুতোয় এখানে থাকা চলে না—

অনু অশোকের দিকে তাকায় না। কি জানি অশোক হয়ত হাসছে। ওর দিকে চাইলে হয়ত লজ্জা পেয়ে যেতে হবে।

খানিক পরে বলে, সত্যি কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল···আপনি রাতারাতিই তৈরী করে ফেললেন হাঁসপাতাল মিণ্টুর নামে···আমি এলুম আপনার সহকারী হয়ে···

অশোক তাড়াতাড়ি সংশোধন করে,—সহকারী নয় সঙ্গী হয়ে—

অনু লাল হয়ে উঠে। অজান্তেই। বলে, সমস্তটাই যেন স্বপ্ন···

—আগে স্বপ্ন ছিল···এখন সত্যি হয়েছে!···কই কিছু খাওয়াবে নাকি? ···ভারি ক্ষিধে পেয়েছে···

অশোক কত সহজ হয়ে এসেছে। অনুর মনটা যেন ফুলে ওঠে। বাইরে থেকে প্রচুর ঠাণ্ডা মুক্ত বায়ু এসে যেন ঢুকছে।··· পাহাড়ের শীতল হাওয়া সমতলে এসে নামছে···।···

অনু বলে, বেশ ত, গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজো করবো।

বস্তির মেয়ে হলে কি হয় অনু কথা বলতে পারে বেশ। অশোক তার দৃষ্টির মধ্যে অর্থ এনে বলে, মাইনে পেয়েছো মনে হচ্ছে···আচ্ছা, আর এক দিন খাবো খুব করে···

অশোক যখন বেরিয়ে আসে হাঁসপাতাল থেকে তখন বেশ রাত হয়েছে। কম্পাউণ্ডের রাস্তার দুধারে ওয়ার্ডের স্তিমিত আলো এসে পড়ছে জ্যোৎস্নার মত! অন্ধকারে গা-ডোবানো বাড়ীগুলোর কোলে কোলে আলো পড়েছে। বাড়ীগুলোকে দেখাচ্ছে ফুলঝরাণো শিউলিগাছের মত!

অশোকের বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে। তার স্বপ্ন সফল হয়েছে এতদিনে।

মিণ্টু ঘুমিয়ে আছে এই স্বপ্নের মধ্যে!

মিণ্টুর সেই অসহায় কাতর দৃষ্টিটা আজও মনে পড়ে,—এই কলমটা আমিই নিয়েছিলুম ডাক্তারবাবু—

অশোক অন্যমনস্কের মতই তাকায় পকেটের দিকে। সোণার ক্লীব লাগানো কলমটা অন্ধকারের মধ্যেও জ্বলছে।

আর জ্বলছে না-দেখা রাজ্যের ওপার থেকে দুটি আলো।

অনুর উজ্জ্বল দুটি চোখ!

অশোক আলো-দেখানো অন্ধকারের মাঝ দিয়ে এগিয়ে আসে।

অনু সারাদিনই কাজ করে চলে হাঁসপাতালের মধ্যে, এ ওয়ার্ড থেকে ও ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কোন রোগীর গায়ে হাত বুলোয়, কেউ যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে তাকে আশ্বাস দেয়, কারও ওমুধটা ঢেলে দেয় মেজার গ্লাসে। এমনি করে সকলের তদারক করে বেড়ায়। ইমারজেন্সী কেসগুলো বেশী করে খোঁজখবর করে।

তারপর প্যাথলজি বিভাগে আসে। অশোকের অনেক কাজ নিজের থেকেই শেষ করে দেয়। অনেক অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করে রাখে। অবাক হয়ে যায় অশোক। ছোটখাটো experiment গুলো কি সহজে আয়ত্ত করে নিয়েছে ও।

যখন খুব ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করে অনু তখন অশোকের খুব ভালো লাগে দেখতে। অশোক দেখতে আসে ওকে।

অশোক এসে যন্ত্র নিয়ে নিজেই বসে যায়। টেষ্টটিউব নিয়ে ঢালাঢালি স্থরু করে দেয়!

অনু এতক্ষণ কাজ করছিল। অশোক এসে বাধা দেওয়ায় অনু যেন রেগে ওঠে। বলে, আমাকে ফাঁকি দিচ্ছেন আপনি?

—ফাঁকি? মানে?···অশোক অনুকে রাগতে দেখে হাসে।

—এসব বাজে কাজ এখন আপনার না করলেও চলতো—

—বলো কি? এসব অত্যন্ত জরুরী কাজ!···অশোক মুখটা গম্ভীর করে কাজের গুরুত্বটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করে।

অনু এইবার হাসে। বলে, নার্সের কোয়ার্টারে ঢুকে আপনার এত জরুরী কাজ···লোকে বিশ্বাস করবে?

—সে কি? অশোক যেন হতাশ হয়ে বলতে থাকে—তোমার কথা শুনে প্রায় লজ্জা পাচ্ছি···

অনু হাসি চেপে নিয়ে মিশ্রিতস্বরে বলে, একটা ছুতো পেলেই আপনি ছুটে আসেন···! বলুন, সত্যি নয়?

অশোক হেসে ওঠে অনুর বলার ভঙ্গী দেখে। বলে, খানিকটা সত্যি তবে অনেকটা মিথ্যে !···

এবার অনুর হাসির পালা। অনু হাসে। সহজ সরল কিন্তু অনুচ্চারিত হাসি !

অশোক কি বলবে ? চেয়ে চেয়ে দেখে অনুর দিকে।

জলোচ্ছাস যেমন সুন্দর। জলোচ্ছাসের আবেগও তেমন সুন্দর।

হঠাৎ ওয়ার্ড থেকে ডাক আসে অনুর। অনুকে না পেয়ে কোন রোগী যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। খেতে চাইছে না একটুও।

অনুকে উঠতে হয় তাড়াতাড়ি। ছুটে যায় ও ওয়ার্ডের দিকে।

অশোক ওর যাওয়ার দিকে দেখে। বিলীয়মান ছায়াটাও যেন আকর্ষণ করে।

ছায়া নয় একটুকরো আলো যেন সরে যাচ্ছে।

হাঁসপাতালের বারান্দায় জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। চাঁদে ভরা রাত্তির ! জ্যোৎস্নার মতই পুলকে আবেগে সমস্ত হৃদয়টা যেন ভরে আসছে। যেখানে যেখানে অস্পষ্ট অন্ধকার সেখানে সেখানে কিছু বেদনার ইঙ্গিত।···

জাহাজের ডেকের মত মোটা কালো রেলিঙ দেওয়া বারান্দার ধারে গা এলিয়ে দিয়ে দাঁড়ায় অনু। সমস্ত দেহ-মন জ্যোৎস্নার আবেগের মধ্যে ডুব দিয়ে থাকে। কেমন একটা স্নিগ্ধ শীতল উত্তেজনা···।···

ঢেউ উঠছে চারদিকে। জ্যোৎস্নার বন্যা বড় প্রবল। অনুর মনে হয় শুধু ডুব দিতে।

এককালে অনু ভাল গান গাইতো। সত্যি তার গলাটা শোনবার মত মিষ্টি ছিল। তাই বস্তির মধ্যে থাকতে হলেও গান সে কিছু কিছু শিখেছিল। কিন্তু সে-সব গান দারিদ্র্যের ঝড়ে কখন কবে চতুর্দিকে ঝরে ঝরে লুটিয়ে পড়েছে।

অনেকদিন পর তাদের আবার কুড়িয়ে নিচ্ছে অনু। ওর তরল কণ্ঠ-সঙ্গীত জ্যোৎস্নার সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে।···গান ত নয় হৃদয় হতে উৎসারিত জ্যোৎস্নাধারা।

অনেকদিন পর হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিয়েছে ও।

অশোক যে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল বারান্দার একপাশে অনু তা একেবারেই খেয়াল করে নি।

অশোক তাই চুপ করে শোনে। চাঁদে-ভরা আকাশে একপাল শুভ্রশ্বেত বলাকা যেন উড়ছে।

জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ !

অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকবার পর হঠাৎ অনু লক্ষ্য করে অশোককে। মনে হয় ওর ছায়াম্লান মূর্তিটা ত' বহুক্ষণই ছিল। তবে চমক লাগলো কেন ?

অশোক কিছু বলে না, চুপ করে দেখে, আর স্থির হয়ে শোনে।

গান শেষ করে অনু বলে, কি ভাবছিলেন ?

অশোক এতটুকুও সচকিত হয়ে ওঠে না। বহুদুর থেকে নদীকে দেখা গিয়েছিল সাগরের পানে ছুটে আসতে। গভীর সাগরের বুকে নতুন করে ত' কোন আলোড়ন নেই। শুধু ঘনতর শান্ত শীতল আহ্বান আছে নদীর পানে।···

অশোক বলে, বলো ত কি ভাবছিলুম ?

—ভাবছিলেন মেয়েটার মতলব ভালো নয়।

—না ধরতে পারো নি !···ভাবছিলুম, কী সুখ—

অনু হঠাৎ পূরোপূরিভাবে তাকায় অশোকের দিকে—

অশোক বলে চলে,···ভাবতেই সুখ···ওরা বেঁচে ওঠে আমাদের হাতে··· আমাদের সেবায়···

—হ্যাঁ···সত্যি। অনু চোখ নামিয়ে নেয়।

—আর কি ভাবছিলুম শুনবে?···যদি রোজ কাজকর্ম্মের পরে এমন একটা গান শুনতে পেতুম···

—ঠাট্টা করছেন বুঝি? অনু যেন আহত হয়ে প্রশ্ন করে।

—তোমার এত কাজ করে দিচ্ছি···একটু ঠাট্টা না হয় করলুম···মন্দ কি?

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে অনু। জ্যোৎস্নার মত অশোককে যেন অনুভব করা যায়!···খানিকক্ষণ পরে অনু বলে, কই আপনার সেই ভীষণ দরকারী কথাটা বললেন না ত?···

অশোক এইবার একটু যেন সচকিত হয়ে ওঠে। বলে, হ্যাঁ···বলি—অশোক হেসে নেয় একটু···বলছিলুম কি সবাই বাঁচবে তোমার হাতে···একজন কিন্তু আধমরা হয়ে রইলো—

—কার কথা বলছেন? অনু বিস্মিত প্রশ্ন তোলে।

—তোমার সামনে যে হতভাগ্য সশরীরে দণ্ডায়মান। অতি সহজেই বলে ফেলে অশোক।

অনু বিচলিত হয় একটু। বলে, ওঃ ভারী ঠাট্টা করেন আপনি।

এগিয়ে যেতে চায় অনু। অশোকের কাছে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না আজ!

অশোক ডাকে, শোনো।

—কি?

—না কিছু না।

—তবে ডাকলেন কেন?

—তুমি সাড়া দিলে কেন?

হো হো করে হেসে ওঠে দুজনে।

জ্যোৎস্নায় ডুবে চাঁদ আর পৃথিবী দুজনেই হাসে।

আকাশ ও মাটি ঝলমল করে ওঠে।

—এগারো—

পাগল হয়ে উঠেছেন রায়বাহাদুর কাগজখানা পড়তে গিয়ে। রাগে, ক্ষোভে, উত্তেজনায় ঠক ঠক করে কাঁপছেন তিনি। এ-যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। এতবড় জমিদার রায়বাহাদুর শশধর চৌধুরী তাঁর বিরুদ্ধে কাগজে এমনইভাবে বেনামী চিঠি লেখার সাহস কার?

হাতের পাশের লাঠিটা তুলে নিয়ে মেঝেতে দুবার দুম দুম করে ঠুকে রায়বাহাদুর দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে বসেন!···কালো কালো অক্ষরগুলো যেন কালো কালো বিষধর সাপ···চোখের সামনে সব কিলবিল করছে।···

কোন যাদুকর এই বিষধর সাপদের খেলাচ্ছে অন্তরীক্ষ থেকে?

মাথার ভেতরটা চন্ করে ওঠে।

রায়বাহাদুর ছুটে আসেন কাগজখানা নিয়ে হেমনলিনীর কাছে। কার এই কাজ বুঝতে তাঁর আর বাকী নেই। খবরটা হেমনলিনীর মুখের ওপর ধরে দেওয়া দরকার!

হেমনলিনী তাঁর বাতের ব্যথায় আত্মস্থ হয়ে বসেছিলেন। রায় বাহাদুর ঘরের মধ্যে ঢুকেই একেবারে যেন ফেটে পড়েন—

—দেখেছো, দেখেছো···এই দেখো আজকের কাগজ···বেনামী চিঠি আমার বিরুদ্ধে···১৩ নম্বর বস্তির যত নোংরা তার জন্যে নাকি দায়ী আমি?···

—রাম বলো। হেমনলিনী এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চান কথাটা!

রায় বাহাদুর আগের মতই জ্বলছেন তখনও!—এ কার কীর্তি জানো? —তোমার ঐ ভাবী জামাইয়ের! আমি নাকি খারাপ লোক, আমি নাকি

চামারের মতন বস্তির ভাড়া আদায় করে থাকি···মড়কের জন্যে নাকি আমিই দায়ী···বুঝলে ? বুঝতে পাচ্ছো কিছু ?

—আর একটু চেঁচিয়ে বলো···শুনতে পাই নে···। বোকার মত বলেন হেমনলিনী।

কথা শুনে আরও চটে ওঠেন রায় বাহাদুর। গলা চড়িয়ে বলেন, এই সময় তোমার তামাসা ?···স্বামীর বিপদে তামাসা ?···

আরও অনেক কিছু বলতে গিয়ে রাগের মাথায় এমন আটকে যায় যে অসম্ভবরকম চুপ করে যান তিনি।

—রাম বলো···আমি ভুগছি আমার বাতের ব্যথায়—

—চুলোয় যাক তোমার বাত···তোমার বাত নিয়ে মর তুমি···। বলি এর পেছনে আসল কথাটা বুঝতে পাচ্ছো ?—কাগজটা নাড়তে নাড়তে তিনি বলেন—সামনে কর্পোরেশনের ইলেকশান···মানে আমাকে এবার কিছুতেই দাঁড়াতে দেবে না···আমার সঙ্গে শত্রুতা···তোমার ঐ ভাবী জামাতা বাবাজীর ভেতরে ভেতরে এই সব অভিসন্ধি···

দরজার বাইরে কার ছায়া নড়ে। হরিপদ এসে কখন দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে হরিপদ বলে, আমাকে ডাকছিলেন বড়বাবু ?

রায়বাহাদুর ওর কথার জবাব দেন না। ওকে দেখেই বলতে থাকেন, তোমাকে বলে দিচ্ছি হরিপদ···যত টাকা লাগে···ভূতো পণ্ডিতের ঐ মেয়েটাকে উৎখাত করতে হবে বস্তি থেকে···যদি দরকার হয় ঘর দোর জালিয়ে দেবে···

রায় বাহাদুরের চোখে আগাম অগ্নি লাগে। চোখ দুটো জ্বলছে।

হরিপদ মিষ্ট হাস্যে হাত কচলায়। বলে, বড়বাবু মনে করেছিলুম তাই করবো···কিন্তু পাখী যে পালিয়েছে।

—পালিয়েছে ? কোথায় ?

—আমাদের অশোকবাবু ছুঁড়িটাকে মোটা মাইনের চাকরি দিয়েছেন হাঁসপাতালে···

—বটে! হুঁ···রায় বাহাদুর চিন্তিত মুখে লাঠির বাঁটের রূপোর মকরের মুখটা চেপে ধরেন!

— আবার শুনেছেন···বস্তির সবাইকে শেখানো হয়েছে কেউ ঘরভাড়া দিয়ো না···

—কেন? কেন? ভাড়া দেবে না কেন শুনি?—উত্তরটা যেন হরিপদর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে এমন ভাবে প্রশ্ন করেন উনি ওকে।

—ওই ত···বলে কে···শুনতে পেলুম···ছুঁড়ি নাকি ম্যানেজার··· অশোকবাবুর হাঁসপাতালের ম্যানেজার···

হেমনলিনীও বাতের ব্যথা ভুলে চমকে ওঠেন—ম্যানেজার!

—আজ্ঞে হ্যাঁ মা···মেয়েছেলে ম্যানেজার! ডাক্তারবাবু ওর কথায় ওঠেন আর বসেন···ছুঁড়িটাই ত সব মা···

হঠাৎ ডলি এসে ঢোকে ঘরের মধ্যে। হরিপদ চুপ করে যায় ওকে দেখে।

ঝড়-খাওয়া গাছের মত এলোমেলো দেখাচ্ছে ডলিকে। ডলি হরিপদর দিকে তাকিয়ে ডাকে, হরিপদ—!

—আজ্ঞে দিদিমণি! একেবারে কেঁচো হয়ে গেছে ও। ডলির রাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় আছে ওর অনেকদিন।

—তোমাকে কি কানাকানি আর গোয়েন্দাগিরির জন্যে রাখা হয়েছে?···

স্থিরলক্ষ্য তীক্ষ্ণ-তীরের মত প্রশ্ন।

হরিপদ আমতা-আমতা করে—আজ্ঞে···আজ্ঞে···

—যত রাজ্যের নোংরা গুজব এনে কেন তুমি বাবার কানে তোলো?

—আমি মিথ্যে বলিনি দিদিমণি। হরিপদ হঠাৎ বলে ফেলে।

—তোমার কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে আমি জানি! তোমাকে মানা করে দিচ্ছি এই শেষবার…যাও বেরিয়ে যাও—

হরিপদ দ্বিরুক্তি করে না। বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

এক ঝড়ে বহু কালো মেঘ উর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে।

ডলি বাবার দিকে ফেরে এইবার—বাবা, আপনি কেন হরিপদকে আস্কারা দেন?…পায়ের জুতো মাথায় ওঠে দেখতে পান না!…

—সমস্ত লণ্ডভণ্ড হতে চললো…কিছু দেখতে পাচ্ছো না মা? রায় বাহাদুর অদ্ভুতভাবে বলেন।

অগ্ন্যুৎপাতের পর আগ্নেয়গিরি থেকে শুধু ধোঁয়া ওঠে।

—লণ্ডভণ্ড আপনি নিজেই করেছেন বাবা! মাথা নীচু করে কঠিন স্বরে বলে ডলি।

—আমি!—হাতের মধ্যে লাঠির মুঠো আবার দৃঢ় হয়ে আসে রায় বাহাদুরের!

—আপনি পরের কথায় নাচেন…ইতরলোকগুলোর কানাকানি বিশ্বাস করেন…

—আর এই যে খবরের কাগজখানা।…কাগজখানা বাড়িয়ে ধরেন তিনি অধৈর্যের মত!

—হ্যাঁ আমি দেখেছি! আপনার লোক গিয়ে বস্তি থেকে ভাড়া আদায় করে…তাদের অবস্থার দিকে আপনার চোখ নেই…কাগজে মিথ্যে কথা লেখে নি বাবা!

আশ্চর্য! আকাশেরও নীল রঙ্ ফিকে হয়ে আসছে।…

—তুমি কি বলতে চাও অশোকের এ কাজটা ভালো!…

—আপনি আগে থেকে সাবধান হলে এ কাজ সে করতো না বাবা। ডলির স্বরে কান্না নেমে আসছে। ভারী কান্নার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে ওর

কম্পিত স্বরে—কিন্তু আপনারা জানেন না…এ বিরোধের শেষ ফলাফল আমাকেই ভুগতে হবে…সমস্ত অপমানটা আমাকেই বয়ে বেড়াতে হবে…

ঝড়-লাগা গাছে ডাল-পালা ফুল-পাতা অসহায়ভাবে ঝরে পড়ছে।…

ঝড়ের ধুলোয় আকাশ ফিকে হবে না কেন?

এদিকে হরিচরণও চিন্তিত হয়ে পড়েন। হাজার হলেও শশধর চৌধুরী তাঁর অনেকদিনের বন্ধু। বিশেষ করে তাঁর মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের একটা ব্যবস্থা করবার চেষ্টা চলছে দু'তরফ থেকে। সেই শশধরের বিরুদ্ধে অশোকের এমন অভিযানটা বরদাস্ত করা যায় না। শশধর আবার সামনের ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন। এখন যদি অশোকের চেষ্টায় কাগজে এরকম সব নিন্দা বার হয় তাহলে ভাববার কথাই বটে। অশোক এতদিন বস্তির উন্নতি নিয়ে মেতে ছিল, সে হল এক কথা আর এ হল অন্য ব্যাপার। এ ব্যাপারকে অত সহজে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। তাঁর নিজের দিকে থেকে এবং অশোকের দিক থেকেও ব্যাপারটা সঙ্গত নয়। কাগজে বেনামী চিঠি বার হলেও, খবরটা ত' আর চাপা নেই যে এর মূলে আছে অশোক নিজে।

এর আগে অশোককে অন্য দিক দিয়ে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু পারেন নি। তবে তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হন নি তিনি। কিন্তু এবারের কথা অন্য।

শোভাকে ডেকে হরিচরণ পরামর্শ করেন। শোভা ছাড়া আর কে-ই বা আছে আলোচনা করবার। বলেন, অশোক আবার একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে তুললো মা…কাগজে আবার কি সব বের করে বসেছে…

—লোকের দুঃখদুর্দশার কথা কাগজেই ত বেরোয় বাবা—শোভা ধীরে ধীরে বলে।

—কিন্তু শশধর আবার সামনের ইলেকশানে দাঁড়াবে…অশোকের এ কাজটা কি ভাল হল মা?…আর যাই হোক শশধর আমার বাল্যবন্ধু!…

—অশোকের অন্যায় কোথায় হল বাবা ?

—হল বই কি মা ! শশধরকে সে মুখে মুখে বুঝিয়ে দিতে পারতো···কিন্তু কাগজে ছেপে দেওয়া···

—সত্যি কথার জন্যে খবরের কাগজ। অশোক সত্যি কথাই বলেছে বাবা।

চারিদিকেই এমনি টুকরো আলোচনা চলে।

অশোককে নিয়ে বড় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে আজকাল।

এদিককার আলোচনাটা হেমনলিনী আর অশোকের মধ্যে।

অশোক এসেছে পরীক্ষা করতে হেমনলিনীকে। রোজের মতই ভালো করে পরীক্ষা করছে অশোক হেমনলিনীকে।

আগে আগে অশোককে দেখলেই হেমনলিনী অনেকটা সুস্থ বোধ করতেন। তাই চিকিৎসা হোক আর না হোক নিয়মমত আসাটাই অশোকের একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কিছুদিন হল সে মন হেমনলিনীর বদলেছে। আজকাল রীতিমত চিকিৎসার কথা হয় অশোকের সঙ্গে। হেমনলিনী মনে মনে হাঁপিয়ে ওঠেন। অশোক আসল চিকিৎসার কথাটাই এড়িয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা যখন এতদূর ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো তখন হেমনলিনী সেদিন কথাটা একেবারে প্রকাশ না করে আর পারলেন না। সোজাসুজিই প্রশ্ন করে বসলেন অশোককে,—বাবা অশোক তবে কি আমার যোল কড়াই কাণা ?

অশোক একমনে পরীক্ষা করে যাচ্ছিল ওঁকে। আজকাল ওঁকে দেখতে হয় মন দিয়ে। চিকিৎসা যখন চলছে।···

অশোক বলে, কেন বলুন ত !

—তুমি আজ পর্যন্ত আমার আসল কথাটার কোনো জবাব দিচ্ছ না কেন ?

—কোন আসল কথাটা ? অশোক সহজে সোজা জবাব দেবে না।

—তুমি বিয়ে করবে কি না—?—হেমনলিনী কি বলবেন ঠিক করতে পারেন না।

—অনিচ্ছে নেই!

—ডলি কি তোমার অযোগ্য? হেমনলিনী আজ এমনভাবে কথা বলছেন যে মনে হয়, হয় তাঁর পায়ের বাত কোনদিনই তেমন ছিল না কিংবা হঠাৎ সব সেরে গেছে!

অশোক হাসি দিয়ে ঢাকা দেয় জবাবটা। বলে, আমি কি ডলির যোগ্য?···

হেমনলিনী হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। চেয়ারের মধ্যে দুলে ওঠা তাঁর থেমে গেছে। কাঠ হয়ে বলেন, বাবা, তোমাদের একালের কথার ফাঁদ আমি বুঝি নে!···তুমি না হয় অনেক কাজের লোক···ডলিকে এবার তুমি পাশে টেনে নাও না কেন?···সে তোমার সঙ্গে কাজ করবে!

অশোক এতক্ষণ পরীক্ষা করছিল ওঁকে। এবার হাত গুটিয়ে সরে দাঁড়ায়। বলে, খুব আনন্দের কথা! তবে কি জানেন···আমার সঙ্গে দেশের কাজ যে করবে···কিংবা করতে চায়···সে নিজেই আমার পাশে এসে দাঁড়াবে···আমাকে টেনে নিতে হবে না—

অশোক মুখে হাসলেও মনে সে যে হাসছে না তা ওর মুখ দেখেই বোঝা যায়।

এর থেকে পায়ের বাত অনেক ভালো। অশোকের কথা শুনে চুপ হয়ে যান হেমনলিনী।

অশোক দাঁড়ায় না। স্ট্যাণ্ড থেকে হাত বাড়িয়ে টুপিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

এদিকে নিখিল আর রুণু নির্জন বাইরের ঘরটা বেছে নিয়েছে। তাদের আলাপের বিষয় আলাদা, কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সেরে নিতে চায় নিখিল। ছোট ভূমিকা, ছোট বক্তব্য, অল্প সময়েই কাজ!

এদিক ওদিক তাকিয়ে নিখিল বলে, ডলি এসে পড়বে না ত!

ডলিদের বাড়ীতেই ব্যাপার। ডলির এসে পড়াটা বিচিত্র নয়। তবু রুণু বলে, কেন? বলতে গিয়ে হেসে ফেলে ও অলসভাবে।

নিখিল পকেট থেকে একটা নেকলেস বের করে রুণুকে দেয়। বলে, Excuse me কদিন থেকে তোমাকে একলা পাবার চেষ্টা করছিলুম···এটা তোমায় চমৎকার মানাবে রুণু···

বলতে গিয়ে নিখিল এমনভাবে তাকায় রুণুর দিকে যেন ও সেই অপরূপ রূপ তার দেখছে।

আলগোছে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করে রুণু ওটা।

নিখিলের দেওয়ায় যেন লতিয়ে পড়ছে ও।

একটু থেমে রুণু বলে, সুদটা বুকে পেলুম···এবার আসলটা চাই যে!

—Of course! আজ মেট্রোয় গিয়ে কথা হবে—

অল্প কথা অল্প কাজ। কাজ শেষ হলে রুণু নতুন প্রশ্ন তোলে—ফুলের তোড়াটা কার?

—শ্ শ্ শ্···চুপ!

দরজার দিকে ইসারা করে থেমে যায় নিখিল! দরজা দিয়ে ডলিই আসছে!

নিখিল হঠাৎ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে, How glorious! এই নাও··· তোমার জন্যেই এনেছি ডলি!

—আমার জন্যে? ধন্যবাদ! কিন্তু ওটা রুণুকে দাও!

—রুণুকে···my God! নিখিল ভণিতা করে প্রাণভরে।

রুণুও চুপ করে থাকে না। ডলিকে বলে, রাগ করছো কেন ডলি?

—রাগ? তোমাদের ওপর! রাগ করি নি ভাই।...আমি বলি আড়ালে আবডালে আপনি ত রুণুকে এটা ওটা দিয়েই থাকেন—

—My God! তোমার কথা শুনে প্রায় চমকে উঠছি ডলি। নিখিল চমকের ভান করতে গিয়ে ঠকে যায় ডলির কাছে।

—আমার কথা খুব সাধারণ। দু নৌকায় পা দেবেন না মিষ্টার রায়—

—What do you mean?

—আপনার দুর্বুদ্ধি অনেক দেখেছি, কিন্তু আপনার চাতুরী অসহ্য। ডলির স্বর হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠছে।...

—I see—নিখিল তার স্বরূপে ফিরে আসছে—তুমি আগে বলতে আমি বোকা, এখন বলছো চতুর...I am possibly both... but I will be a little frank to you to-day...তুমি শুধু বোকা—চতুর নয়...তাই তোমার এই দুর্গতি—

—আপনার মন্তব্যের জন্যে আমি অপেক্ষা করে নেই মিষ্টার রায়—

—জানি! এও জানি অশোক তোমাকে বিয়ে করবে না...কেন না অনুকে আমরা দেখেছি...তুমি তার এক তিলও যোগ্য নও! অনেক মেয়ে আমার দেখা আছে...but Anu is the noblest of the lot...আচ্ছা good bye.

Good bye. চাপা গলায় বিদায় দেয় ডলি নিখিলকে।

ক্রিসেন্থিমাম যেমন লাল হয়ে ফুটে উঠেছে, দমকা হাওয়া তাকে তেমন ভাবেই ঝরিয়ে দেয়। দিকে দিকে।

লাল হয়ে বিছিয়ে থাকে ধূলিধূসর ভূমির 'পরে। ক্রিসেন্থিমাম।

ফোটা ফুল আর ঝরা ফুল। এ দুয়ের বিভিন্ন স্থান আছে।

—বারো—

কোথায় আবার মড়ক সুরু হয়েছে। কোলকাতারই উপকণ্ঠে কোন বস্তি অঞ্চলে দেখা দিয়েছে কলেরার মারাত্মক অভিযান। নিরীহ অসহায় মানুষের দল বিনা চিকিৎসায় বিনা ব্যবস্থায় দলে দলে মরছে।

অশোককে যেতে হবে সেখানে। অশোক তার কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলেছে। তার হাঁসপাতালের তরফ থেকে একটা ইউনিট নিয়ে যেতে হবে সেখানে। সঙ্গে যাবে সে নিজে আর অনু। মানুষের সেবা করার ব্রত তারা নিয়েছে। সেই ব্রত রক্ষা করতে হবে। দেরী করবার সময় নেই।

মড়কের চেয়েও আরও বেশী কালো আতঙ্ক সবার মুখে। সবার অর্থে হরিচরণ, শোভা, রায়বাহাদুর, হেমনলিনী আর ডলি।

অশোককে কি কোনমতেই ফেরানো যায় না! কোথায় কোন নোংরা বস্তির মধ্যে গিয়ে পড়বে। শেষটা জীবনই বিপন্ন হবে না কি? এ ত আর শুধু বস্তি সংস্কার নয়, রীতিমত মরণের সঙ্গে যুদ্ধ।···সকলে তাদের নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করে অশোককে রাজী করাবার জন্যে।

কিন্তু রাজী করা যাবে না অশোককে। তার আদর্শ তার কর্তব্য অনেক আগেই সে স্থির করে বসে আছে। সেখান থেকে তাকে টলানো যাবে না।

শোভা এসেছিল অনুর কাছে। এসে বলেছিল, একদিন তুমি এসেছিলে আমার কাছে তোমার ভাইয়ের জন্যে আর আজ আমি এসেছি আমার ভাইয়ের জন্যে তোমার কাছে। ওকে এই সিদ্ধান্ত থেকে ফেরাও ভাই।

কিন্তু অনুরও সাধ্যে নেই অশোককে ফেরায়।

অনুরও বুকটা কাঁপে। এতখানি বিপদের মধ্যে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়া—

অনু মিনতি করেই বলে, তোমার গিয়ে কাজ নেই।

অসাধারণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে অনু অশোকের দিকে। আর কিছু দিয়ে বাঁধতে না পারলেও শেষে দৃষ্টি দিয়েই আচ্ছন্ন করে ফেলবে নাকি অনু ওকে?

অশোক দৃঢ় হয়ে হাসে। বলে, ওঃ তুমিও কি ভয় পেলে?

—আমি? একটুও নয়!—অনুর জলভরা চোখে সাহসের আলো চকচক করে—আমি ত বলেছি যে আমিই যাবো—

—মত বদলায় নি ত?

—না। কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না।

শুধু লাল নয় অনেক রঙের অনেক ফুল ঝরছে পথে-পথপ্রান্তে।

—তুমি যাবে, অথচ আমি যাবো না···মানে?

—তোমাকে বিপদের মুখে পাঠাতে সাহস হয় না···

নদী বড় বেশী কাছে এসে গেছে সাগরের!

অশোক গভীরভাবে হাসে। বলে, বাঃ তুমি নার্স থেকে একদম নারী হয়ে উঠলে দেখছি···একদিন তুমিই আমায় এ কাজে নামিয়েছিলে···পথ দেখিয়েছিলে···মনে পড়ে অনু?···

—কিন্তু তোমার জীবনের যে অনেক দাম!

—দাম যদি কিছু থাকে শোধ করতে হবে···এ কথা ভুলো না—

অনু চুপ করে থাকে। কথা বাড়িয়ে আর ভুল বুঝতে চায় না অশোককে। ভুল বোঝার ভুল আর সে করবে না।

ভুল করে বসলো অশোক নিজে। ভুল বোঝার ভুল নয়, ভুলের বোঝায় আপনাকে হারিয়ে ফেলার মারাত্মক ভুল।...

হাঁসপাতালের ইউনিট নিয়ে অশোক এসে কাজ জুড়ে দিয়েছে সেই বস্তির মধ্যে। কলেরার মহামারীতে বস্তি প্রায় উজাড় হতে চললো। চারিদিকে নোংরা ময়লা আর রোগ। কেবলই রোগীর কাতরানি আর কান্নার কলরব ভেসে আসে। এদিকে ওদিকে মড়া কান্না...দুর্গন্ধ আসছে বীভৎস রকমের।...

অম্লানবদনে নোংরা ঘেঁটে চলেছে ওরা। সেবা করছে। ওষুধ দিচ্ছে। একটার পর একটা ইনজেকশন দিয়ে চলেছে অশোক। যাদের এখন রোগে ধরে নি তাদের টীকা দেওয়া হচ্ছে।

চারদিকে শুধু কর্মব্যস্ততা আর তৎপরতা। তবুও তারই মধ্যে অসাধারণ সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে ওদের। মৃত্যু নিয়ে খেলা নয়, খেলা জীবন নিয়েও। একটু অসাবধান হলে তার মূল্য দিতে হবে হয় ত।

সেই ভুল, সেই অসাবধানতা করে বসলো অশোক। বরাবরই ওখানে জল ফুটিয়ে নিয়ে খাচ্ছিল ওরা। সেদিন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে অশোক বীজাণু-দূষিত অফোটানো জল খেয়ে বসলো।

ঠাণ্ডা স্বচ্ছ পরিষ্কার জল। কিন্তু কি ভীষণ মৃত্যুবীজ লুকিয়ে আছে তার মধ্যে।

অনুর লক্ষ্য এড়ায় না। অশোকের কথা তার মনে আছে—তুমিই আমায় এ পথে নামিয়ে এনেছো অনু।—সে পথে একা ত' যেতে দেবে না অনু।—

অনুর কণ্ঠ আর্তনাদ করে ওঠে, কি করলেন ?...

অশোক ম্লানভাবে হাসে—। বলে, ও কিছু না...ঠিক আছে।...

—কিন্তু তুমি যে এ ভুল করতে আমাদের সবাইকে মানা করেছিলে... আর তুমি নিজে—ভয়ে উৎকণ্ঠায় আর কান্নায় অনুর স্বর বোবা হয়ে আসে।

—হ্যাঁ অনু আমি ভুল করেছি। অশোক বিবর্ণমুখে স্বীকার করে অনুর সামনে। অনুর কাছে ছাড়া তার ত স্বীকার করবার আর কেউ নেই।

অশোকের মুখের ওপর ছায়া নামছে।···

মৃত্যুর সংগ্রাম চলেছে অশোকের রক্তে।

কেবিনের মধ্যে চিকিৎসা চলেছে তার। ডাক্তাররা ঘিরে রয়েছে। ইনজেকশন···হট-ওয়াটার ব্যাগ···।

কিন্তু তবু সমস্ত চেষ্টাকে অতিক্রম করে মৃত্যুর বিজয় রথ এগিয়ে চলে।

অনু রয়েছে অশোকের মাথার কাছে। মাথার কাছে থাকলেও অনু ঘিরে রয়েছে অশোককে চারদিক থেকে।···তার দৃষ্টি তার আগ্রহ···অশোককে রক্ষা করছে।

ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে ছেড়ে দেন! অনু ডাকে ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চন করে ঘাড় নাড়েন। সদুত্তর কিছু দেন না। দেবার মত কিছু নেই! অনু স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকায় অশোকের দিকে। সব দিয়েও কিছু হল না। অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকে—অশোক!

এত আস্তে ডাকে মনে হয় নিজের ভেতরই কাকে যেন সে ডাকছে, খুঁজছে।···

অশোক সাড়া দেয় না।

ডলিরা সব এসে গেছে খবর পেয়ে। শোভা হরিচরণ সকলেই। ওরা সব ঘিরে থাকে অশোককে! কিন্তু অশোক কোন কথা বলতে পারে না ওদের সঙ্গে!

অনেক রাতে অশোক একটু একটু সাড়া দেয়। তখন অনুই একা রয়েছে মাথার দিকে। চারদিকে মৃত্যুর কালো ছায়ায় ভীষণতার মাঝখানে অশোকের ম্লানদীপের শেষ রশ্মিটুকুর দিকে তাকিয়ে অনু রাত জাগে।

গরম জলে সেঁক দিতে দিতে অবশেষে একটুখানি ভালো বোধ করছে। প্রদীপ নিভার আগে শেষ আলো।

অনু কোমল গলায় বলে, এখন একটু ভালো আছ তুমি!...

—হ্যাঁ অনেক দূরে যেতে হবে...তাই ভালো আছি।

অশোক আজ কত কাছে। অনুর সমস্ত হৃদয়টা যেন নিংড়োতে থাকে মোচড় দিয়ে দিয়ে। সমস্ত রস তার ঝরে যাবে যেন।...

অনু বলে, বলতে নেই অশোক...ও কথা বলতে নেই।—এ কি চোখে জল কেন তোমার? নিজের চোখের জলকে আড়াল করে অনু প্রশ্ন করে।

—নিজের জন্যে কাঁদিনে অনু। কিন্তু যাদের জন্যে কাজে নামলুম... তাদের সেবা করে যেতে পারলুম না...

—তুমি চুপ করো অশোক...

অশোক থামে না। শেষ কথা তাকে বলে যেতে হবেই। আর ত সময় নেই। যে অসাবধানতার যে ভুলের মূল্য সে দিতে চলেছে তার চরম ক্ষণে আর এক ভুল সে করবে না।

জীবনের ওপার থেকে অশোক বলে চলে, গোধূলির শেষ রাঙা আলোকটুকুর মত—তুমি তাদের দেখো অনু...যাদের কেউ দেখে না কোনদিন ...যারা মুখ বুজে মরে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে...

—তুমি না থাকলে আমায় শক্তি জোগাবে কে অশোক?...

যে পথে অনু নামিয়ে এনেছিল অশোককে সে পথের এক প্রান্তে এসে জিজ্ঞাসার বিঘ্ন ওঠে।

—তারাই তোমার শক্তি অনু! যাদের কেউ চেনে না...কেউ জানে না সেই তারা সবাই—

গোধূলির শেষ আলো আগামী প্রভাতের খবরটুকু দিয়ে যায়!

—এ মৃত্যু আমার নয় অনু···এ তাদেরও অপমৃত্যু যারা অপমানের ভারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে··· । তাদের কথা কি কেউ ভাববে না··· ।

শ্রান্ত হয়ে পড়ছে অশোক। তার জীবনের শেষ সম্বল শেষ পরমায়ু দিয়ে কথা বলছে।···

—এবার একটু ঘুমোও তুমি। অনু অশোকের চুলের মধ্য দিয়ে হাত বুলিয়ে দেয় ধীরে ধীরে।···

—হ্যাঁ, শান্ত হয়ে ঘুমোবো এবার অনু···

জীবনকে অস্বীকার করে ঘুম আসে অশোকের।···

গোধূলির শেষ আলোয় এত বেশী আর এতক্ষণ ধরে রাঙ্গিয়ে রাখে আকাশখানা যে মনে হয় আকাশের রঙ বুঝি বদলালো।

নদী এসে পড়ে সাগরের বুকে। বিস্তীর্ণ হয়ে বিরাট রূপ নেয় নদীর শেষ প্রান্ত।

সাগরের মৃত্যু কি সেখানে ?